হাতেখড়ি

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - সুজিত কুণ্ডু
স্ক্যান করেছেন - সুজিত কুণ্ডু
এডিট করেছেন - অপ্তিমাস প্রাইম

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রপত্রিকার কোন বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান কিংবা নিজে স্ক্যান করে দিতে চান তাহলে নিচের ইমেইল এ যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com

ঢেঁকিদার কাণ্ড কারখানা

রচনা ঃ প্রবুদ্ধ
ব্যঙ্গচিত্র ঃ
চণ্ডী লাহিড়ী

বিষ্ণুমন্দিরে ভীড়

ঢেঁকিদা সহজে টাকা করার মতলব আঁটছেন

দু বস্তা ছোলা কিনে আনলেন ঢেঁকিদা

বিরাট লম্বা একটা পাথরের নোড়া কেনা হলো

গভীর গর্ত করে বস্তাসমেত ভিজে ছোলা গর্তে পোরা হোল

তার ওপর নোড়া বসিয়ে মাটি চাপা দিলেন

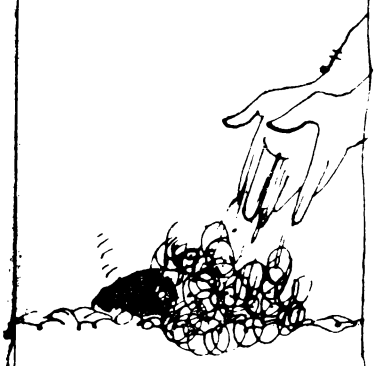

প্রথম ঐ যায়গায় জঙ্গল গজালো. ভর্তি হোল আগাছায়

এক রাত্রে ঢেঁকিদা স্বপ্ন দেখলেন শিব এসে বলছেন —

হাতেখড়ি

১৬ই আষাঢ়, ১৩৯২ ঃ ১লা জুলাই, ১৯৮৫ ঃ ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা

প্রধান উপদেষ্টা ঃ প্রবোধচন্দ্র বসু (প্রবুদ্ধ)

প্রচ্ছদ ঃ বাবলু বর্মণ

অলংকরণ ঃ বাবলু বর্মণ ও বিমলকান্তি দাস

সম্পাদক ঃ বিভূতিভূষণ মণ্ডল

আমাদের প্রেস, ৮৩, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭০০০০৯ থেকে শ্রীস্বপনকুমার বসু কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দাম—২.৫০ পয়সা।

সূচীপত্র

চৌকিদার কাণ্ডকারখানা—চণ্ডী লাহিড়ী অঙ্কিত ও প্রবুদ্ধ রচিত —দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রচ্ছদ পৃষ্ঠা

ধুলোর আড়াল পেরিয়ে—শিশিরকুমার মজুমদার	২
আটুল বাঁটুল—রচনা ও অঙ্কন—বাবলু বর্মণ	৫-৬
তিড়িঙ্গড়া—গৌরাঙ্গ ভৌমিক	৭
ওরা সমুদ্রে যায়—শক্তিপদ রাজগুরু	৯
গোয়েন্দা ফেলুদা এবং রিকু ঝিকু—প্রণব হোড়	১৪
ইউক্যালিপটাস—অশেষ রায়	১৯
কলম উধাও—পরেশ ভট্টাচার্য	২০
সাপ—বিকাশকান্তি সাহা	২৩
কপিকল—অঞ্জলি রায়	২৫
বৃষ্টির জল কি সত্যিই জীবাণুমুক্ত—বিকাশকান্তি সাহা	২৮
পুরাতনী—বঙ্কিমচন্দ্র—চট্টোপাধ্যায়	৩০
অলৌকিক—সমীর চৌধুরী	৩১
অদ্ভুতুড়ে নেমন্তন্ন—প্রণব মাইতি	৩৪
ম্যাজিক শেখা কঠিন নয়—যাদুকর বি. কুমার	৩৭
প্রবাদপুরুষ বিধানচন্দ্র—মনোজকুমার সূত্রধর	৩৮
বেলাভূমি বকখালি—পার্থ ঘোষ	৪০
এখন তারা নেই—প্রদীপকুমার মিত্র	৪২
ঘোড়ার ডিম—নিশিকান্ত মজুমদার	৪২
এক গুচ্ছ ছড়া—নির্মলকুমার বিশ্বাস	৪৩
খোকাখুকু চলে আয়—বিশ্বনাথ মৈত্র	৪৩
লাল চিরুনি—সম্রাট বসু	৪৪
হাসাহাসি	৪৫
পাখিটা—বিভাস রায়চৌধুরী	৪৬
শরীর ও স্বাস্থ্য—ডাঃ ডি. আদিত্য	৭৪
জিতবো বলেই তো যাচ্ছি—পি. কে.	৪৮
খেলাধুলোর প্রাঙ্গণে—ক্রীড়ারসিক	৫০

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ মির্জাপুর বাইণ্ডিং ওয়ার্কস

সম্পাদকীয়

আমার কিশোর বন্ধুরা,

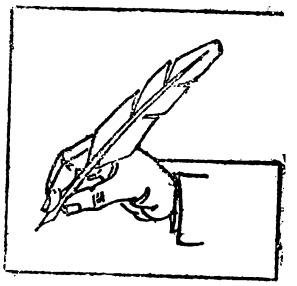

নবীনা বর্ষার সজল স্নেহ-স্পর্শে সজীব হয়ে উঠেছে প্রকৃতি। গ্রাম বাংলার মাঠে-প্রান্তরে কৃষকের ক্ষেতে ক্ষেতে নবীন ধানের চারাগুলো দামাল শিশু থেকে আজ কৈশোরের দোর গোড়ায়। তাদের কচি মুখ ঘিরে চাষার বুকে আজ ভবিষ্যতের সোনালী স্বপ্ন! ঠিক তেমনি তোমাদেরকে ঘিরে সমগ্র দেশ, জাতির বুকে রয়েছে একবুক আশা, আকাঙ্ক্ষা, একবুক প্রার্থিত কামনার সোনালী স্বপ্ন! সমগ্র জাতির আগামী দিনের সোনালি ফসল তোমাদের সবুজের মধ্যেই যে আত্মগোপন করে আছে সবার অলক্ষ্যে। কামনা করি তোমাদের জীবন সোনালি ফসলে ভরে উঠুক—সমগ্র দেশবাসী হোন সেই ফসলের অংশভাক্।

বন্ধুরা, এই আষাঢ়স্য পঞ্চদশ দিবসে আমাদের যাত্রা শুরু হলো। আমাদের নবযাত্রায় এটা আমাদের প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা। কিশোর বন্ধুরা, আমাদের এই যাত্রা পথে তোমাদের সকলের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা কামনা করি। সেই সঙ্গে আমাদের যারা নবীন এবং প্রবীণ হয়েও চির নবীন পাঠক/পাঠিকা আছেন, কামনা করি আমাদের এই যাত্রাপথে আপনাদের সকলের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা আমাদের পাথেয় হোক।

বিভূতিভূষণ মণ্ডল

১/৭/৮৫

বিদেশী গল্পের ছায়ায়

ধুলোর আড়াল পেরিয়ে

শিশির কুমার মজুমদার

ঘন ঘন গাড়ির হর্ন বাজিয়েও ভিড় হটাতে পারলেন না বাদলবাবু। এদিকে এত অজপাড়া গাঁয়ে গাড়ির তেমন চল নেই। তাই বোধ হয় গাড়ির ভয়ও তেমন নেই গাঁয়ের লোকদের মনে। তা ছাড়া সামনের পথ জুড়ে নিশ্চয়ই কিছু হচ্ছে, আর সেই তামাসা দেখার জন্যই ভিড় করেছে সবাই। তামাসা শেষ হলে তবে তো পথ ছাড়বে।

চামুণ্ডেশ্বরের মন্দিরটা যে কোন দিকে তাও ঠিক জানেন না বাদলবাবু। রাস্তায় লোকের কাছে জিজ্ঞাসা করে করেই এতদূর এসেছেন। এখনও কতটা পথ যে যেতে হবে তাঁকে তা কে জানে। বেলা প্রায় দশটা বাজে। বার হয়েছেন বাড়ি থেকে সেই ভোর ছটায় উপোস দিয়ে। চামুণ্ডেশ্বরের পূজা দিয়ে প্রসাদ খাবেন সবার আগে, তারপর খাওয়া দাওয়া। তার আয়োজন অবশ্য সঙ্গেই চলেছে।

নিজের কষ্টের কথা ভাবেন না বাদলবাবু। চিন্তা ওর বুলার জন্য। বুলার কষ্ট আর উনি দেখতে পারেন না। তার কষ্ট দূর করার জন্য যে যা বলে, তাই করেন। এখন এসেছেন হরদেওপুরের অচেনা অজানা পরিবেশে শুনছেন, এখানকার জল হাওয়ায় নাকি যাদু আছে। যার যা রোগ তা একদম সেরে যায়। শহরের ডাক্তারের মত নিয়ে আজ প্রায় আড়াই মাস হল হরদেওপুরের রঘুনাথ ঠাকুরের বাসা ভাড়া নিয়ে আছেন। সত্যিই যেন যাদুর ছোঁয়াচ লেগেছে বুলার দেহে। এতদিন ওষুধ আর ডাক্তাররা যা করতে পারেননি তাই করেছে এখানকার জল হাওয়া। কিন্তু তবুও বুলার মনের গভীর ব্যথার জট এখনও খোলেনি। ওর তাই মুখে হাসি নেই। মনেও তাই বোধ হয় আর বাঁচার ইচ্ছা নেই।

কদিন আগে রঘুনাথ ঠাকুর বুলার মাকে ডেকে বললেন, বৌমা, খুকি তো এখন অনেক সুস্থ হয়েছে, যাও মা, এবারে চামুণ্ডেশ্বরের পুজোটা দিয়ে এসো। চামুণ্ডেশ্বর বাবা বড় জাগ্রত। খুকি একদম ভাল হয়ে যাবে।'

বাদলবাবু গাড়ির দেখা শুনা করছিলেন। বড় সখের গাড়ি ওর। বুলার মা এসে বলল, 'দাদা, বুলার জন্য চামুণ্ডেশ্বরে পূজা দিতে যাব। নিয়ে যাবে?'

তাই চলেছেন বাদলবাবু চামুণ্ডেশ্বরের পথে। কিন্তু একি? পথের প্রায় সবটা জুড়ে কেউ নিশ্চয়ই কোন খেলা দেখাচ্ছে। ডিগি ডিগি করে বাজনার আওয়াজ ভেসে আসছে ভিড়ের মাঝ থেকে। সবাই বেঁহুশ হয়ে জটলার মাঝ বরাবর তাকিয়ে আছে। পিছনে গাড়ির হর্ণ তাদের কানেই যাচ্ছে না। জ্বালালে লোকগুলো। গাড়ির দরজা খুলে নামলেন বাদলবাবু। একবার বলে দেখবেন সবাইকে, যদি সরে পথ দেয়। ভিড়ের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন উনি। অবাক হয়ে দেখলেন, একটা নোংরা ময়লা ছেলে, বড় জোর বয়স আট-দশ হবে, এক হাতে প্রাণপণে ডুগডুগিটা বাজাচ্ছে একটা তোবড়ান টিনের বাক্সের উপর বসে। আর ওর সামনে মোটা সোটা সাদা ধপধপে একটা কুকুর দুপায়ের উপরে বসে, সামনের দুপা দিয়ে বাজনার তালে তালে সমানে তালি দিচ্ছে।

সাহেবী পোষাক পরা বাদলবাবুকে দেখে ভিড়ের সবাই এপাশ ওপাশ সরে জায়গা করে দিল। আর ছেলেটাও ওকে দেখে হঠাৎ বাজনা থামিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে কুকুরও তালি বাজানো বন্ধ করে সামনের দুপা মাটিতে নামিয়ে হাঁপাতে লাগল। বাদলবাবু কোন দিকেই না তাকিয়ে বললেন, 'চামুণ্ডেশ্বরে পূজা দিতে যাচ্ছি। তোমরা পথটা ছেড়ে দেবে একটু? আর এদিকেই কি চামুণ্ডেশ্বর?' ভিড়ের সবাই হাঁ হাঁ করে মাথা নেড়ে পথ ছেড়ে দিল।

দুপাশে চেপে আসা কুঁড়ের মাঝখানে পথটা মোটেও চওড়া নয়। সবাই পাশে সরে যাওয়াতে গাড়ি যাবার পথ হল তবু। শুধু ছেলেটা তার তোবড়ান টিনের বাক্স থেকে নড়ল না। ঝোলাটা শুধু কাছে টেনে নিতেই কুকুরটাও ওর পাশে সরে দাঁড়াল। ছেলেটা তো আচ্ছা হতচ্ছাড়া! সবাই নড়ল, ও নড়তে পারল না!

গাড়িতে ফিরতেই বুলা জিজ্ঞাসা করল, 'ও মামা, কিসের খেলা হচ্ছিল?'

গাড়ি স্টার্ট দিয়ে বাদলবাবু বললেন, 'কুকুরের, ওই ছেলেটা দেখাচ্ছিল।'

অতটুক পুচকে ছেলে! অবাক বুলা বলল, 'ওর ওই সাদা কুকুরটা?'

'হ্যাঁ।' ছেলেটাকে পাশ কাটাতে কাটাতে বললেন বাদলবাবু, 'ঠিক হয়ে বস। আমি গাড়িতে স্পীড দিচ্ছি।

'তোর শরীর ভাল আছে তো রে?' বুলার মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'এত দূরের পথ ভাবিনি। কষ্ট হচ্ছে না তো রে তোর?'

বুলা ওসব কথার কোনও উত্তর না দিয়েই বলল, মা, আমিও কুকুরের খেলা দেখব। ওই সাদা কুকুরটার। কুকুরটা ভারী সুন্দর, না?'

মা বললেন, পুজো দিতে চলেছিস, পুজোর কথা ভাব বুলা। তা না কুকুর!'

'তুমি ছেলেটাকে বল না মামা, আমাদের বাড়িতে আসতে, বলল বুলা।

'পাগল হলি তুই? ষাট সত্তর মাইল এখান থেকে হরদেওপুর, ও যাবে কি করে?'

সামনের পথের দিকে নজর রেখে বললেন বাদলবাবু।

'কেন গাড়িতে। আমরা ওকে গাড়িতে তুলে নেব।' মহা উৎসাহে বলল বুলা। 'ওই তো অতটুকু পুচকে ছেলে। আর ওই কুকুরটা। ওরা তোমার পাশে বসে বেশ যেতে পারবে মামা।

যাওনা মামা ওদের সঙ্গে—,

মা ধমকে উঠলেন, 'যত আজে বাজে কথা তোর বুলা।'

বুলা মার কোলে মুখ লুকিয়ে বলল, 'যাও, আমি পুজো দেব না। তোমরা কেউ আমাকে ভালবাস না।'

বাদলবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'আহা, তুই ধমকাস না তো মিলি। না রে বুলা, ফেরার সময় না হয় ওদের তুলে নেব গাড়িতে। এখন স্নানটান করে মন্দিরে যাচ্ছি না? ছোঁওয়াছুয়ি লাগবে।'

মুখ তুলে মহা খুশিতে হাততালি দিয়ে বুলা বলল, 'সেই ভাল মামা। তুমি না মামা, খুউব ভাল। মা একদম ভাল না।'

মা রাগের ভান করে বললেন, 'ওরে পাজী পেয়ে।'

বুলা আবার মার কোলে মুখ লুকাল।

বুলার বয়স আট। রোগে রোগে সারা দেহ ওর ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। রোগ ওর দেহের নয়, মনের। মনের রোগে ভুগে ও ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। হাতের আঙ্গুলগুলো সরু সরু, চোখ্ কোটরে বসা। হাসতে পারে না ও, কাঁদতেও ভুলেছে! সারাক্ষণ হয় বিছানায় শুয়ে কাটায়, নয় তো ইজিচেয়ারে বসে দূরের আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। সেই যেবার শহরে হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা হয়, কতগুলো গুণ্ডা ওর বাবাকে ওর চোখের সামনেই কুপিয়ে খুন করল! ওদেরও মারত, পুলিশ আসতে কোনমতে বেঁচে গেল ও আর ওর মা। সেই থেকেই ওর অসুখ। মনের অসুখ, সে আর কিছুতেই সারে না।

মামা ওর বিরাট বড়লোক। সারাক্ষণ ওদের নিয়েই আছেন। কত খেলনা কিনে দিয়েছেন, কত বই। কত বড়বড় ডাক্তার এসেছেন, কত ওষুধ দিয়েছেন। বুলার যখন যা ইচ্ছা হয়, তাই করেন উনি। আগে তো বুলা ছেলেমানুষ ছিল, তাই কত ছেলেমানুষি করেছে ও। মাঝরাতে ফুলকপি ভাজা খেতে চেয়েছে। ভীষণ বৃষ্টিতে গোলাপ ফুল আনতে বলেছে। সব এনে দিয়েছেন মামা। এখন বুলা বড় হয়েছে, একটু বোঝেসোঝে, এখন আর ও অমন করে না। তা না করলেও বুলা হাসে না, কাঁদে না। বুলা কিছুই করতে চায় না। উদাস দৃষ্টি মেলে শুধু তাকিয়ে থাকে কোন দিকে কে জানে! ওর মার চোখে তাই জল সারাক্ষণ।

বড় বড় ডাক্তাররা বলেছেন, রোগটা মনের। হাসি খুশি রাখুন ওকে, ক্রমে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেরে উঠবে। সেরেই উঠতে চায় বুলা। আবার স্কুলে যাবে বই ব্যাগ নিয়ে। আবার মার সঙ্গে মার্কেটে যাবে জিনিস কিনতে। কিন্তু মাঝে মাঝে ওর কি যে হয় কে জানে, তখন শুধু ভয় আর ভয় ওর চারদিক ঘিরে ধরে। ঘুমের মাঝে ভীষণ দেখতে গুণ্ডাগুলো তেড়ে আসে। চোখ মেললে মনে হয় ওর, লাল রক্তের স্রোত ভেসে যাচ্ছে চারদিকে। ওঃ কত রক্ত! তখন আর ওর কিছুই ভাল লাগে না। ঘুমোতে ভয় করে। জেগে বসে থাকতে ভয় করে। খেতে গেলে মনে হয় রক্ত। কান্নাও আসে না তখন ওর। কবে যে ও ভাল হবে।

ছোটখাট কতকগুলো টিপি আর টিলার মাঝখানে এসে পড়ল ওরা। পথ এখানে এঁকে বেঁকে গেছে। ঝোপ জঙ্গল আর পাথরে ভরা জায়গাটা ভারি সুন্দর। একটা বাঁক নিতেই হঠাৎ সামনে বড় টিলাটার ধারে মন্দিরের চূড়া দেখা গেল। ছোট্ট পুরাণো মন্দির। সামনে কিছুটা বাঁধান। এক পাশে টিলার ধারে একটা বড় পাথরের ফাটল থেকে হুড় হুড় করে জলের ধারা নামছে। সে জায়গাটাও পাথর ফেলে বাঁধান। অপূর্ব সুন্দর চারদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য। মন্দিরের সামনে গাড়ি থামালেন মামা। বাইরের দিকে তাকিয়ে বুলা খুশিতে বলল 'কি সুন্দর না মা? আমি কিন্তু একটু পাহাড়ে উঠব।'

পুজা দিয়ে প্রসাদ খেতে বেলা হল। খাওয়া দাওয়া মিটতে মামা, হাতঘড়ি দেখে বললেন, 'বেলা তিনটেয় ফিরবো। ততক্ষণ একটু বিশ্রাম কর বুলা।'

বুলা বলল, 'তুমি বিশ্রাম কর। মাকেও বল। আমি এখন প্রজাপতি ধরব।' ক্রমশ

হামবাগ শহরের তিন মাঝিমাল্লা
নৌকো চালায় রোজ, দেয় জোর পাল্লা।
নৌকোর পাটাতনে, বসে কেউ জাল বোনে,
পাদ্রিরা মাছ ধরে, গায়ে আলখাল্লা।

॥ ২ ॥

জেনে ফেলে জিভ কাটি পিসিমার ডাকনাম
পুঁটু ছিল এককালে,—পুঁটু খেত কাঁচা আম।
কাঁচা আমে দাঁত টকে গিয়েছিল ভারি ঠকে,
খেতে গিয়ে হিমসিম কদমা ও কালো জাম।

॥ ৩ ॥

সেদিন খেখেছি আমি, সদিন না, মনে হয় কালই
আকাশে সূর্যটা হয়ে গেছে যেন এক মস্ত বেড়ালি।
অশ্বত্থের ডালে উঠে বেড়ালিটা গেল চটে,
'কোথায় লুকোলি ছায়া' বলে তাকে দিল জোর গালি।

এই নাও!
বাবা অন্ধকে দুটো পয়সা ছাড়বে ?
ফট করে পয়সাটা দিয়ে দিলি লোকটা আদৌ অন্ধ নয় কালকে তোমাদের পাড়ায় দেখেছি
তাই নাকি রে আটুল.
পরেরদিন
ঐ দেখ ব্যাটা বসে আছে!
দেখলি বাঁটুল! এই পাড়ায় বোবা সেজে····
তাইতো দেখছি রে আটুল!
সাহায্য করুন! আমি বোবা-কালা
ছোড়াদুটোর মতলব দেখছি ভাল নয় সটকে পড়তে হবে!
না! মিচকে দুটো টের পেয়ে গেছে! আবার পেছন-পেছন আসছে! আসুক! বাছাদের একটু গোত্তা মেরে ছেড়ে দোব।
চাঁদ আমার কোথা যাও নাচি-নাচি!
দমাদ! দুম! গদাম!

কি গো বাঁটুলদা বোবা কালা হলে কবে থেকে ?
আমি বোবা কালা
কি হোলো বলতো মাহির আটুল! উল্টে আমরাই ওর কাছে ধোলাই খেলুম
ওটাকে জব্দ করতেই হবে না হলে প্রেস্টিজ একেবারে নড়বড়ে হয়ে যাবে!
আরেকদিন
শিগগির চল ভেদোদের পাড়ায়! আজ ব্যাটা ল্যাংড়া সেজে গ্যাঁড়া মারছে।
আ-হা- বেচারা খোঁড়া মানুষ এই নাও কিছু পয়সা।
এই নে খুটু বিলেতী খাবার ঐ ল্যাংড়ার বাটিতে আরও আছে!
ইক!
লোকটা তাহলে ল্যাংড়া নয়? এতক্ষন ভড়কি দিচ্ছিল
আপনারাই বলুন। কিরকম দিলুম!

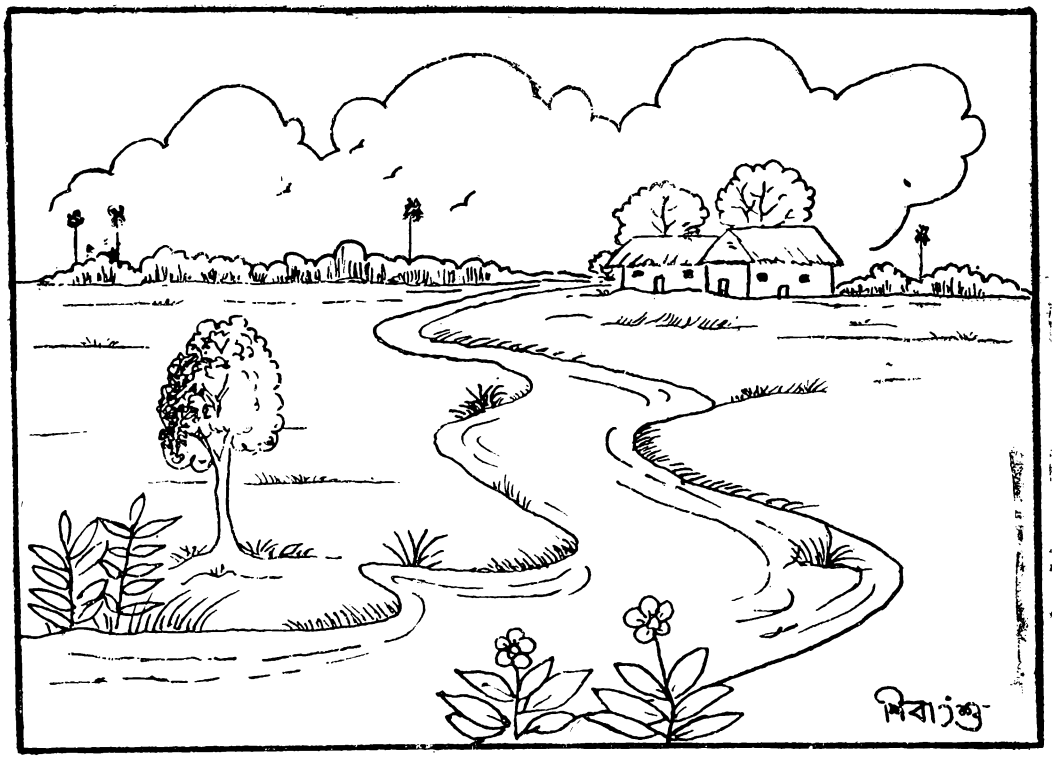
শিবাংশু

ওরা সমুদ্রে যায়

শক্তিপদ রাজগুরু

কেষ্টকে দেখেছিলাম দীঘার মোহনার কাছে বালিয়াড়িতে বসে থাকতে। দীঘার সমুদ্র তীরে, নৌকার ধারে কাছে বালিয়াড়িতে ওদের মত অনেক ছেলেকেই দেখা যায়।

কালো পোড়খাওয়া চেহারা, যে বয়সে ছেলেরা স্কুলে যায়, খেলাধুলা করে, ওরা সেই বয়সেই জীবনকে অন্য চোখে দেখেছে। কঠিন বাঁচার লড়াই-এ সামিল হয়েছে। ওদের জন্য খেলার মাঠ নেই, স্কুলের কলরব নেই, আনন্দের অবকাশ নেই, এখন থেকেই নিজের খাবার ওদের নিজেদের সংগ্রহ করতে হয়। কাউকে মা ছোট ভাইদের আহার্যও সংগ্রহ করতে হয়।

সেদিন সকালে বেড়াতে বেড়াতে গেছি মোহনার ওদিকে। শীতের সকাল। মিষ্টি রোদে গা তেতে ওঠে মিঠে আমেজে; ওদিকে তখন মাছের মরসুম। সমুদ্রের বুকে বহু লঞ্চ, নৌকার ভিড়।

বালিয়াড়ির উপর অস্থায়ী চালা বেঁধে মহাজনদের আড়ত বসেছে। বালির উপর চাঁই করা রুপালী নানা সামুদ্রিক মাছ, দু পাঁচটা বিকটদর্শন হাঙ্গর, সোর্ড ফিস গাদা করা আছে। নীলামে বিক্রী হচ্ছে মাছগুলো।

কাল রাতেও সমুদ্র উত্তাল ছিল, ঝড়ো হাওয়ার দাপট এখনও কিছু আছে। ভিড় পার হয়ে চলেছি, ওদিকে মোহনার ধারে একটা অস্থায়ী চায়ের দোকানের মাচায় বসে চা খাচ্ছি, হঠাৎ নজরে পড়লো ছেলেটা।

কালো শীর্ণ চেহারা, রংটা কেমন ফ্যাকাসে, বিবর্ণ, মুখে চোখে একটা আতঙ্কের ছাপ। খালি গায়ে একটা ধুসো চাদর জড়ানো।

একটুন চা দেবা ?

চায়ের দোকানী চমকে ওঠে—ভাগ ব্যাটা। মাগনা চা খাবার জায়গা এটা ?

ছেলেটা চুপ করে যায়। ওর চাহনিতে কি বেদনার আভাস !

আমার স্ত্রী সঙ্গে ছিল। সে ছেলেটাকে ধমকাতে দেখে বলে—ওকে চা পাউরুটি দাও, আমি দাম দিচ্ছি। ছেলেটা মাছের চোখের মত বিবর্ণ চোখ তুলে চাইল।

কমলা বলে—চা খা।

দাম টাম মিটিয়ে উঠলাম। আবার বালিয়াড়ি ভেঙ্গে ফিরছি দীঘার হোটেলের দিকে। বাতাসে মাছের আঁশটে গন্ধ। হঠাৎ কার ডাকে চাইলাম।

সেই চায়ের দোকানের ছেলেটা আসছিল আমাদের পিছু-পিছু—সেই-ই ডাকছে।

কমলা শুধায়—কি রে ?

ছেলেটা বলে—আপনারা কোলকাতায় থাকেন মা ?

কমলা চাইল—কেন রে ?

ছেলেটা কি যেন বলতে গিয়েও পারছে না। ওর রুক্ষ চুলগুলো উড়ছে, গায়ে খড়ির মত নুনের দাগ। চোখ দুটোয় ব্যাকুল চাহনি। বলে সে—কলকাতায় নে যাবেন মা। কাল মরতি মরতি ফিরে এস্‌ছি। দরিয়ায় কালই ডুবতাম।

—কেনরে ?

সামনে সমুদ্রের বিস্তার। ঢেউ গুলো উঠছে পড়ছে, তীরে এসে সগর্জনে হানা দেয়। আছড়ে পড়ে জোয়ার আসা সমুদ্রের ঢেউ। পাঁচিল সমান ধাবমান ঢেউ একটার পর একটা হানা দেয় বেলাভূমিতে। দূর দিকচক্রবালে দুচারটে কালো বিন্দুর মত নৌকা ফিরছে সমুদ্র থেকে।

তীরে বসে আছে আশপাশের গ্রামের ছেলেমেয়েরা, ওই সমুদ্রফেরা নৌকায় ফিরছে তাদের বাবা, ভাইয়েরা। কাল রাতে তুফান-ঝড় গেছে। দু-একটা নৌকাও নাকি ডুবেছে সমুদ্রে। হয়তো অনেকে আর ঘরেই ফিরবে না।

ছেলেটা বলে -কাল রাতে দরিয়ায় জালে গেছনু, তা পেরায় চারঘণ্টা বেয়ে লঞ্চ দরিয়ার নে গে নৌকা-গুলানকে ছেড়ে দিলে, জাল বেড় দিই চলেছে ত্যাখন মুখ আঁধার হয়ে রাত্তির নামছে। আঁধার দরিয়ায় ঝড় আচমকা, ক্ষেপে উঠলো দরিয়া। চীৎকার শোনা যায় না। পেল্লাই ঢেউ, আমাদের নৌকাখান কাৎ মেরে ঢেউয়ের মাথায় উঠে পালটি খেয়ে গেল, ছিটকে পড়লাম। একখান ঢেউয়ের মাথায় তুলে নে গেল, আমিও হাতের কাছে জালের রশিটা বলসমেত ধরে ফেলে চেল্লাতে লাগলাম। কে শোনে কার কতা, ভাসতেছি হিমঠাণ্ডা নোনা দরিয়ায়, নাকানি চোবানি খাই তবু জালের রশি ছাড়ি নি।

কতক্ষণ ছিলাম জানিনা, মাঝরাতে কারা তুলেছিল। ত্যাখন আমার ঠিক ঠাওর নাই। দ্যাখেন আমার হাত পা ফ্যাকসা হই আছে।

ছোট ছেলেটির চোখে তখনও মরণের ভয়ের ছায়াটা ফুটে ওঠে। ভীত সন্ত্রস্ত চোখে দূর সমুদ্রের দিকে চেয়ে বলে সে আর দরিয়ায় যাবোনি গো! কলকাতা নে চলো, যা করতে বলবে করবো।

কমলার কাজের ছেলেরও দরকার, কারণ কলকাতার বাজারে তেমন ছেলে মেলা ভার। যা আসে খুবই চালু, দুচার মাস থেকেই ফাঁক পেলে ঘড়ি, এটা সেটা নিয়ে কেটে পড়ে।

পাড়াগাঁয়ের এমন একটা সহজ সরল ছেলে পেলে ভালোই হবে, এরা চোর হয় না। আর ছেলেটার বিপদের কথা শুনে কেমন মায়াও হয়।

শুধোই কি নাম তোর ? কোথায় বাড়ি ? কে আছে বাড়িতে ? ছেলেটি বলে—জলধর, আমার বাড়ি ওই তো অলঙ্কারপুর। বাড়িতে মা আছে আর কেউ নাই গো।

বলি, তাহলে বাড়ি গিয়ে মাকে বলবি যে কোলকাতা যেতে দেবে কি না ? যদি মা রাজি থাকে এসে দেখা করবি কাল সকালে। হোটেল ডলফিন চিনিস—

ছেলেটা ঠিক ঠাওর করতে পারে না।

ততক্ষণে আমরা বালিয়াড়ি ভেঙ্গে লোকালয়ে এসে পৌঁচেছি। সাজান দোকান পশার, সৈকতাবাসের বাড়িটা ; ছেলেটাকে হোটেল চেনাবার জন্য হোটেলেও নিয়ে এলাম।

তখন দুপুর হয়ে গেছে।

দোতালার ঘরে নিয়ে গিয়ে বলি—

এই ঘরে আছি। নীচে অপিস ঘরে এসে আমার

নাম লেখা কাগজটা দেখাবি, এখানে আসতে দেবে। কাল সকালে এসে খবর দিয়ে যাবি।

কমলা ছেলেটার শুকনো মুখ দেখে বলে—

বেলা হবে, খেয়ে যাবি চল।

খাবার নাম শুনে ওর চোখ দুটো কি খুশিতে চক্ চক্ করে ওঠে।

কাল থেকে ওর খাওয়া জোটেনি, কথা ছিল সন্ধ্যার মুখে দরিয়ায় জাল বিছিয়ে তারপর রান্না খাওয়া হবে, কিন্তু তা আর হয় নি। নৌকা ডুবে গেছল।

তবু জৈবিক ক্ষুধাটা মুছে যায়নি। গ্রোগ্রাসে ভাত খাচ্ছে ছেলেটা। হোটেলের ডাইনিং রুমের এককোণের টেবিলে বসেছে, এখানের পরিবেশে সে বেমানান।

বেয়ারাগুলোও দেখছে ওকে কৌতূহলী চাহনিতে। ছেলেটা খেয়ে উঠে হাতমুখ ধুতে কমলা ওর হাতে দু'টাকার একটা নোট দিয়ে বলে—বাসে চলে যা বাড়িতে, কাল সকালে এসে জানাবি।

ছেলেটা খুশি হয়ে চলে গেল।

হোটেলের ম্যানেজার দেখেছে ব্যাপারটা। বলে সে, ছেলেটাকে কলকাতায় নিয়ে যাবেন ?

আমি শুধোই, ওকে চেনেন নাকি ?

ম্যানেজার বলে—না। দেখুন ও ব্যাটা যায় কিনা। বেশ তো ভোজন করে ভোজন দক্ষিণা নিয়ে গেল।

কথাটা আমারও খটকা লাগে। তবু কমলা বলে, না, দেখবে ও ঠিক আসবে। আর জাল ফেলতে যাবে না সমুদ্রে।

দেখেছি এখানের মাছ মারা ঘরের ছেলেদের। এইটুকু থেকে ওরা সমুদ্রের ধারে আসে। ডিঙ্গি নিয়ে উথাল পাথাল ঢেউ-এ ঘোরে। সমুদ্রের ঢেউ-এর মাথায় ন্যাংটো ছেলেগুলো সাঁতার কাটে, সমুদ্র ওদের আবাল্যের সাথী, খেলার সঙ্গী !

তবু ওই জলধর দেখেছে সমুদ্রের ভয়াল, করাল সংহার মূর্তিটা। তাই ও পালাতে চায় এই সমুদ্রের থেকে দূরে। অন্য জগতে, মৃত্যুকে দেখেছে সে একবার, বারবার দেখতে চায় না।

তাই বোধহয় পরদিন সকালেই আসে জলধর।

হোটেলের ঘর থেকে বীচের দিকে চলেছি, ছেলেটা তখনও আসেনি।

বলি কমলাকে,—সে আসবে না।

কমলা কি ভাবছে। দেখা যায় ছেলেটা ঝাউবনের ভিতর থেকে আসছে বালিয়াড়ি পার হয়ে।

কমলা খুশি হয়। ছেলেটা তার কথা রেখেছে। শুধায় সে, কি রে তোর মা কি বল্লে ?

জলধর বলে—মা যেতে বলেছে। বলেছে সমুদ্রে আর যাবি না, তোর বাপও সমুদ্রে গেছল আর ফেরেনি। তুইও যাস্ নে।

ছেলেটা মৃত বাবার কথা স্মরণ করে বোধ হয় চুপ করে যায়। চোখদুটো জলে ভরে ওঠে। বলে সে—

আমার বাবাও সেবার সমুদ্রে গেছল। আর ফেরেনি। তাই মাও বল্লে—তুই কলকাতায় যা বাবুদের সঙ্গেই কাজ করগে, কমলা খুশি হয়। বলে সে—

তাহলে কাল দুপুরের বাসেই কলকাতা যাবো। তোরও টিকিট কাটছি। তুই কাল সকালেই চলে আয়। খেয়ে দেয়ে আমাদের সঙ্গে বের হবি। খাবি-দাবি, জামাপ্যাণ্ট পরবি আর মাসে পঞ্চাশ টাকা—

জলধরও মাথা নাড়ে—তাই যাবো মা। সকালেই চলে এসতেছি। ও মাইনে যা দেবেন—ঠিক আছে মা।

কমলা ওকে এবার পাঁচ টাকা দিয়ে বলে—কোথাও খেয়ে নিয়ে চলে যা। কাল সকালেই—

জলধর বলে—হ্যাঁ মা। সকালেই এসতেছি—

চলে গেল জলধর।

কমলা এবার ঈষৎ বিজয়িনীর মত ভঙ্গীতে বলে—

দেখলে তো! ও আসবে আমি জানতাম। আর ছেলেটাও বেশ শান্ত।

বাড়ির কাজের ছেলে—মেয়েদের ব্যাপারটা ওর একান্ত, তাই বলি—ভালো হলেই ভালো। চলুক তো কলকাতা।

কমলা বলে—ও যাবেই। সমুদ্রে আর যাবে না।

...পরদিন সকালে প্রতীক্ষায় আছি, দুপুরে ফিরবো কলকাতা। গোছগাছও হয়ে গেছে। বেলা হয়—জলধরের দেখা নেই। নটা বেজে গেছে। রিসেপশনে খবর নিই ছেলেটা এসেছিল কিনা. ম্যানেজার বলে—ও যাবে কি ?

কমলা বলে—কাল এসে জানিয়ে গেল যাবে—

হাসে ম্যানেজার, ওদের মতিগতি ওই সমুদ্রের মতই দিদি, এই থাকে. এই বদলায়। দেখুন আসে কিনা ?

দশ, সাড়ে দশটা বাজে। কোন পাত্তা নেই জলধর-চন্দ্রের। বলি, ও আসবে না। যা পেয়েছে নিয়ে সটকে গেছে।

কমলা একটু চটে যায়। ছেলেটার সম্বন্ধে তার ধারণা অন্যরকমই। বলে সে, সে চোর নয়।

—তবে এল না কেন ?

কমলা চুপ করে কি ভাবছে। তাড়া দিই।

—চলো, খেয়ে নিই। বারোটায় বাস ছাড়বে।

কিন্তু খেতে যাওয়া হয় না, সব প্রোগ্রামই উল্টে যায়। করিডোরে হৈ হৈ শব্দ শুনে। আমার বাল্যবন্ধু কলকাতার নামী ডাক্তার অবিনাশ হুট করে সকালেই গাড়ি নিয়ে কলকাতা থেকে ছুটির দিনে বের হয়ে পড়ে দীঘায় হাজির হয়েছে এই হোটেলেই। করিডরে দেখা হতে বলে, শুনলাম তোরাও জমেছিস—

জানই আজ যাচ্ছি।

বাধা দেয় অবিনাশ—মানে! আমি এলাম আর তোরা পালাবি ? আজ জমিয়ে আড্ডা দেব, ঘুরবো। কাল সকালে আমার গাড়িতে ফিরে যাব সবাই। আজ তোকে কে ছাড়ছে ?

কাজও তেমন জরুরী নেই। তাই রয়ে গেছি আজও।

বৈকালের মিষ্টি পড়ন্ত আলোয় দীঘার সমুদ্র তীর, ঝাউবন ভরে উঠেছে। আনমনে বেড়াতে বেড়াতে নীচের ওদিকে মেছুয়া বসতির ওদিকে গেছি। এ বেলায় সেই মাছের বাজারের ভিড়, চীৎকার তত নেই। মাছের আমদানী হয় ভোর রাত্রি থেকে বেলা অবধি।

এখন আসলে ঢিলে ঢালা ভাব।

লঞ্চগুলো নৌকা বেঁধে নিয়ে দূর সমুদ্রে চলেছে, অনেকে চলে গেছে। এখন এদিকের সমুদ্রও ফাঁকা।

হঠাৎ ওদিকে ঢোল কাঁসির শব্দে চাইলাম।

কিছু লোকজন ভিড় করেছে, কোন পুজো টুজো হচ্ছে।

সমুদ্রে কয়েকটা নৌকা ঢেউ-এ টাল-মাটাল খাচ্ছে, নৌকাগুলো নোতুন করে রং করানো, কয়েকজন লোক নোতুন ধুতি, গেঞ্জি পরে দড়ি দড়া, জাল বাঁশে তুলে নৌকাগুলোয় রাখছে, একটু দূর দরিয়ায় একটা লঞ্চও তৈরি হয়ে আছে। সমুদ্রে যাবে ওই নৌকা বহর টেনে নিয়ে।

শুধোই, কি পুজো হচ্ছে ?

লোকটা জানায়—নোতুন মহাজনের নৌকা মাছ মারতে যাচ্ছে বাবু, তাই 'তেনাথের' পুজো দিচ্ছে যাবার আগে।

কৌতূহল বশতঃ ওদিকে এগিয়ে যাই। মাছ মারার লোকজন নোতুন কোরা ধুতি গেঞ্জি পরে জালে যাচ্ছে, নৌকায় উঠেছে তারা।

হঠাৎ কার চীৎকার শুনে চাইলাম, কমলাও অবাক, হয়।

—জলধর !

জলধর ততক্ষণে জাল ছেড়ে এগিয়ে এসে—মহাজনের সরকার হবে—তাকে বলে, সরকার মশাই গো, আমার মজুরী থেকে সাত টাকা এই মাঠান্‌কে দিবা এখুনি, ফিরে এলে কেটে নিবা।

জলধর কুল্যে কমলার কাছ থেকে সাত টাকাই নিয়েছিল।

কমলা শুধোয়, তুই যাবি না ?

জলধর একগাল বলে হেসে। না মাঠান্। নস্থমামা নোতুন জাল নামাচ্ছে ওর জালে সমুদ্দে যাচ্ছি।

চমকে উঠি, আবার সমুদ্রে যাবি !

হাসে জলধর। পরণে নোতুন কোরা ধুতি, গেঞ্জি,

কোমরে একটা নোতুন গামছা বাঁধা। বলে সে।

- হ্যাঁ! উ কলকাতায় থাকতি পারবো নি বাবু, সমুদ্দের ডাক না শুনলি থাকতি পারবো নি!

কে ডাকছে ওকে।

বলে সে, যাই গো।

জলধর কমলাকে হঠাৎ প্রণাম করে বলে—চলি—মাঠান—

দৌড়ে গিয়ে একটা নৌকা ঠেলে ঢেউয়ের মাথায় তুলে লাফ দিয়ে তাতে চড়ে বসলো।

বৈকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমেছে।

নৌকাগুলোকে লঞ্চের পেছনে বেঁধে চলেছে ওরা দূর, মুক্ত আঁধার নামা সমুদ্রের দিকে।

সরকারের ডাকে চমক ভাঙে।

—আপনার সাতটা টাকা—

ও টাকা ফেরত দিতে এলে, কমলা বলে—

—জলধরকেই ওটা দিয়ে দেবেন!

ফিরছি হোটেলের দিকে। সন্ধ্যা নেমেছে বালিয়াড়ি, ঝাউবনে। দূর সমুদ্রে লঞ্চ-নৌকাগুলোকে দেখা যায় না। কোথায় হারিয়ে গেছে।

সমুদ্রের গর্জন ওঠে।

জলধর ওই সমুদ্রের ডাক শুনেছে! ওরা সমুদ্র, ওই কঠিন সংগ্রাম মুখর জীবনকেই ভালোবাসে, মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে বাঁচার লড়াই তাদের জীবনের ধর্ম।

তাই ওরা সমুদ্রে যায়।

তোমাদের আঁকা ছবি : ছবির সঙ্গে বয়স, নাম ও ঠিকানা লিখে পাঠাবে।

গোয়েন্দা ফেলুদা এবং রিকু ঝিকু

প্রণব ঘোড়

ফেলুদা'র বই পড়ে ঝিকু'র আজকাল মনে হয় সেও গোয়েন্দা হয়ে গেছে।

গোয়েন্দাগিরি করাটা এমন তো কোন শক্ত ব্যাপার নয়। শুধু ঠাণ্ডা মাথায় একটু সূত্র খুঁজে বেড়ানো, এই যাঃ। ব্যস্, তাহলেই তো কেল্লাফতে! অপরাধী হাতের মুঠোয়। এক এক সময় ঝিকুর মনে হয় ফেলুদা ঠিক যে রহস্যগুলো

উদ্‌ঘাটন করেছে, সেও সেগুলো করতে পারতো। কিন্তু মুস্কিল হলো বাড়িতে মা বাবা তো আর সে কথা বিশ্বাস করবে না। বন্ধু-বান্ধবরাও তাই। এমন কি ছোট বোন রিকুও দাদার কথায় হাসে।

মনে মনে রাগ হয় ঝিকুর। ভাবে, বেশ আমিও দেখে নেবো। আমি ফেলুদা হতে পারি কি না।

একদিন দুপুরে ভাত খেতে বসে বেশ গম্ভীর হয়ে ঝিকু মাকে বলে, 'আচ্ছা মা, তোমার কিছু হারিয়েছে কি?'

'কি হারাবে?' ঝিকুর পাতে মাছের ঝোল ঢালতে ঢালতে প্রশ্ন করেন মা।

'এই ধরো কানের দুল, সোনার হার—'

ওমা, ছেলের একি অলুক্ষণে কথা, 'ঝিকুর কথায় বাধা দিয়ে বলে ওঠেন মা, 'হারাবে কেন হঠাৎ?'

'না এমনি, যদি সে রকম কিছু হয় আমাকে বলতে পারো, খুঁজে দেবো, ভাত খেতে খেতে উত্তর দেয় সে।'

'থাক্, আমার কিছু না খুঁজে মন দিয়ে পড়াশোনা করলেই হবে। গত হাফ-ইয়ার্লিতে অংকে কত পেয়েছিলে মনে আছে?'

চুপসে যায় ঝিকু।

ওর মনের এই দুর্বল জায়গায় আজকাল সবাই আঘাত দেয়। কিন্তু সেই বা কি করবে! অংক যে তার মাথায় একদম ঢোকে না, তার উপর অংক পরীক্ষার আগের দিন সে পাশের বাড়ির মংকাদের কুকুরটাকে খুঁজতে গিয়ে খানায় পড়ে গিয়েছিল। হাত পা কেটে একশা, ঐভাবে কি পরীক্ষা দেওয়া যায়?

আর রিকুটাও বলিহারি যাই। দাদাকে কিনা তোয়াক্কা করে না। ঝিকুর কত ইচ্ছে ছিল ও গোয়েন্দা হলে বোনকে অ্যাসিস্‌টেন্ট করবে। ফেলুদার মতন একটা মোটা সবুজ খাতায় বোন লিখবে কার কি চুরি হলো, কখন চুরি হলো, সন্দেহজনক ব্যক্তি কে কে? এ রকম আরো কত কি! কিন্তু রিকু রাজি নয়, এমনি এমনি ও কাজ

করবে না। বাবার অফিসের মতন ওর মাসে মাইনে চাই। ঝিকুর মাথায় হাত! ও আবার কি মাইনে দেবে! স্কুলের টিফিনের জন্য যে হাত খরচ পায় তাই যদি ও জমিয়ে বোনকে দেয় তাহলে নিজের থাকবে কি? অবশ্য হাতে 'কেস্' পেলে সে রকম অসুবিধা হতো না। ঝিকু ঠিক করেই রেখেছে ফেলুদা'র মতো কোন 'কেস্' হাতে নিলে অ্যাডভান্স নেবে সে পঁচিশ টাকা। কিন্তু 'কেস্' হাতে পেলে তো?

রিকুকে অনেক বুঝিয়েছে ঝিকু, বলেছে, 'দেখ রিকু, একটু ধৈর্য ধর। সাফল্য তাড়াতাড়ি আসে না। তুই আমার সঙ্গে থাক। দেখবি ফেলুদা'র তোপসের মতন তোর নামও সবাই জেনে যাবে'

ঠোঁট উল্টেছে রিকু, 'বয়ে গেছে আমার। ভারি তো তোমার গোয়েন্দাগিরির কাজ। আমি সোজাসুজি বলে দিচ্ছি বাপু, মাসে মাসে যদি মাইনে দিতে পারো তাহলে আমি তোমায় চোর-ডাকাত ধরতে সাহায্য করতে পারি।'

রেগে গেছে ঝিকু, 'তুই তো নিজেই ডাকাতের মতন টাকা চাইছিস—'

'কি, আমি ডাকাত,' দাদার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে রিকু। আঁচড়ে কামড়ে একাকার। শেষকালে মা এসে দু'জনকে ছাড়ালো।

তারপর শাস্তি।

দেওয়ালের দিকে মুখ করে কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকলো রিকু ঝিকু আধ ঘণ্টাখানেক।

দিন দুয়েক তারপর রিকু ঝিকুর কথাও বন্ধ।

* * *

হঠাৎ সেদিন সকালে ঝিকুর বোধহয় কপাল ফিরলো।

দিনটা ছিল রবিবার।

সবে দুই ভাই-বোন পড়ার ঘরে বই-খাতা খুলে বসেছে, হঠাৎ রিকুর বন্ধু তপা এসে হাজির। মুখটা কাঁদো কাঁদো। কি ব্যাপার? না তার বিড়াল টুকিকে সকাল থেকে বাড়িতে পাওয়া যাচ্ছে না। ঝিকুদা'কে এই কেসটা দিতে চায় সে। কে নিলো তার বেড়াল!

একটু খুশি হলো ঝিকু। বাড়িতে এসে যে এভাবে কেউ তাকে কেস দিতে চাইবে আগে তা ও নিজেই ভাবতে পারে নি। কিন্তু মুস্কিল হলো রিকুর বন্ধু তপার কাছে তো ও অ্যাডভান্স টাকা চাইতে পারবে না। এমনিতেই করতে হবে এই

কেসের ফয়সালা। বোনের দিকে আড়চোখে তাকালো ঝিকু। দুই দিন কথা বন্ধ থাকার পর আজ প্রথম কথা বলল রিকু, 'দাদা, তপার বিড়ালকে খুঁজে দাও না।'

'হুম্' গম্ভীর হয়ে খুশিতে টেবিলের উপর দুটো টোকা দিল ঝিকু, 'বিড়ালটাকে কখন থেকে দেখতে পাচ্ছো না তপা?'

'আজ সকালে, ঘুম থেকে উঠেই ঝিকুদা।' বলে তপা।

—'রাত্রে ওটা থাকতো কোথায়?'

—'আমার পড়ার টেবিলের উপর। তবে খুব সকালের দিকে ওর ঘুম ভেঙ্গে যায়। তখন ও বাইরে চলে যায়

'মর্ণিং ওয়াক করে?' বলে ঝিকু।

'বিড়ালের আবার মর্ণিং ওয়াক!' হি হি করে হাসে রিকু।

একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায় ঝিকু। কিছু ভুল বললো নাকি সে?

ব্যাপারটা থেমে গেল তপার কথায়, 'হ্যাঁ ঝিকুদা, সকালে ও একটু পায়চারি করতে যায়।'

'হুম্, বুঝলাম। তা তপা তোমার 'টুকি' খেতো কি?' আবার ঝিকুর প্রশ্ন।

'ডাল, ভাত, মাছ এইসব খেতো। তবে 'টুকি' মাছ বেশি ভালোবাসে।' বলে তপা।

—'তোমাদের বাড়িতে রোজ মাছ আসে?'

—'না, গতকাল ডিম খেয়েছি। আগের দিন হয়েছিল মাংস।'

—'আজ?'

—'আজ তো বাজার হওয়ার আগেই টুকি নিখোঁজ।' বলতে বলতে আবার কেঁদে ফেললো তপা।

একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে ঝিকু। বিরক্তও হয়, তপাকে বলে, 'এরকম কান্নাকাটি কোরো না তপা তাহলে আমার কাজের অসুবিধা হবে।'

চোখের জল মোছে তপা

—'তোমার কাকে কাকে সন্দেহ হয়?'

চুপ করে থাকে তপা।

'কি হলো, বললে না কাকে সন্দেহ হয়,' আবার বলে ঝিকু।

'সেটাই তো বুঝতে পারছি না ঝিকুদা।' বলে তপা।

'হুঁ, বেশ জটিল রহস্য। ঘটনাস্থলে যেতে হবে

একবার। রিকু রেডি হয়ে নে, বেরুব।' বই গোছাতে গোছাতে উঠে দাঁড়ায় ঝিকু। সঙ্গে সঙ্গে রিকুও।

তপাদের বাড়ি যেতে যেতে রিকু ঝিকুর কানে কানে বলে, 'আচ্ছা দাদা, ফেলুদা এই কেসটা হাতে পেলে কি করতো বলতো?'

'কি আবার করতো! আমি যা যা করছি তাই করতো,' বলে ঝিকু।

ভাগ্যিস ঝিকুর চোখে এলো না, রিকু ওর কথা শুনে কিরকম ঠোঁট ওল্টালো। তাহলে বোধহয় রাস্তার মধ্যেই দক্ষযজ্ঞ বেধে যেত দুই ভাই-বোনের।

তপাদের বাড়ি গিয়ে সন্দেহজনক তেমন কিছু চোখে পড়লো না ঝিকুর। বিড়ালটাকে তপাদের বাড়ির সবাই ভালোবাসে। সুতরাং নিশ্চয় শত্রুতা

করে কেউ বিড়ালকে ভোরবেলায় বাইরে গিয়ে ফেলে আসবে না।

তাহলে ?

কর্পূরের মতন তো আর অতবড় জলজ্যান্ত বিড়ালটা উধাও হয়ে যেতে পারে না।

তবে গেল কোথায় সেটা ?

তপাকে ঝিকু জিজ্ঞাসা করে, 'আচ্ছা তপা, তোমাদের পাশের কারো বাড়ি কুকুর-টুকুর আছে ?'

'নেই। কেন ?' তপার প্রশ্ন।

'না এমনি,' বলে ঝিকু, 'অনেক সময় তো কুকুরে বিড়াল খেয়ে নেয়। তাই বলছি।'

ভ্যাক্ করে কেঁদে ওঠে তপা, 'আমার টুকি তাহলে বেঁচে নেই, ঝিকুদা ?'

'আহা, তা কি বলেছি,' তপাকে সান্ত্বনা দেয় ঝিকু। 'আমি শুধু সূত্র খুঁজছি। কোনদিক দিয়ে এগোব, সেটা ভাবছি।

'আচ্ছা দাদা, এবার রিকু বলে,' তপাদের পাড়ায় এক বাড়িতে একজন সাঁওতাল চাকর কাজ করে। সে চুরি করেনিতো বিড়াল ?'

ভাবনায় পড়ে ঝিকু, 'তাই তো, শুনেছি সাঁওতাল লোকেরা বিড়ালের মাংস খায়।'

আবার উচ্চস্বরে কেঁদে ওঠে তপা। 'ঝিকুদা, টুকি তাহলে সত্যি নেই !'

দ্বিধায় পড়ে যায় ঝিকু। মনে মনে সে দ্রুত চিন্তা করে চলে ফেলুদা এই পরিস্থিতিতে পড়লে কি করতো ? তপা যেভাবে কাঁদতে শুরু করেছে, তাতে মাথা ঠিক রাখা দায়। তার উপর রিকুর চোরাহাসি। সে ভেবেই নিয়েছে, তার দাদার দ্বারা এ কাজ হবে না।

ধুত্তোর ! ভারি তো এক বেড়ালছানা। তাকে নিয়ে টানাটানি। এই কেস হাতে না নিলেই হতো। এখন বোঝ ঠ্যালা। বেড়াল খুঁজে দাও, তারপর মেয়ের কান্না থামাও। বিরক্ত হয়ে ওঠে ঝিকু। সমস্ত সম্মান বোধহয় এবার গেল ওর।

পাশ থেকে রিকু বলে, 'দাদা, চলো না তপাকে নিয়ে সেই সাঁওতাল লোকটাকে একবার দেখে আসি।'

ঘাবড়ে যায় ঝিকু। এই মরেছে ! রিকুর কি মাথা খারাপ হলো ! দু'-দুটো অবলা মেয়েকে সাথে

নিয়ে সে যাবে সেই ক্রিমিন্যালের কাছে। যদি লোকটা তেড়ে আসে ওদের দিকে !! অস্ত্রপাতি ঝিকুর তো কিছুই নেই। একদম খালি হাত একা হলে তবু নয় পিঠটান দেওয়া যায় পাঁচিল, থামাখন্দ টপকিয়ে। কিন্তু, এদের নিয়ে গিয়ে····

গভীর চিন্তায় পড়ে যায় ঝিকু। কিন্তু আর পিছ-পা হবার উপায় নেই, যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে।

শেষ পর্যন্ত ঝিকুকে বেরোতেই হলো সাঁওতাল লোকটাকে জেরা করার জন্য। সঙ্গে তপা আর রিকু।

বেশিদূর যেতে হলো না। তার আগেই চাপা গলায় তপা বলে উঠলো, 'ঐ যে ঝিকুদা, সেই সাঁওতাল লোকটা।'

তাইতো, হন্ হন্ করে কালো ভুষণ্ডী মার্কা একটা লোক হাঁটছে। হাতে তার একটা থলে।

তবে কি ঐ থলের মধ্যেই·····

ইউরেকা। এবার আর দেখতে হবে না। তপার বিড়াল নিশ্চয় ঐ থলের ভিতর আছে। রিকু আর তপাকে ঝিকু তার সন্দেহের কথা বলে। হাততালি দিয়ে ওঠে তপা, "ঠিক বলেছো ঝিকুদা, তুমি গিয়ে বলো থলেটা দিতে।"

"না, সেটা কাঁচা কাজ হবে। তার আগে দেখা যাক, থলেটা নিয়ে কোথায় যায় লোকটা, "দাঁতে দাঁত চেপে কিছুটা সিনেমায় দেখা ফেলুদার স্টাইলে কথাগুলো বলল ঝিকু।

কিন্তু, ও মা! ও কি! লোকটা পুরনো কাগজ বিক্রীর দোকানে ঢুকলো কেন? শুধু তাই নয় ঝিকু-রিকু এবং তপা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলো লোকটা থলে থেকে যেটা বের করলো সেটা আদৌ কোন বিড়াল নয়। স্রেফ পুরানো খবরের কাগজ। সেগুলো বিক্রী করতে এসেছে লোকটা।

হতাশ হয়ে পড়ে ঝিকু।

ছিঃ ছিঃ, সে এবার কি বলবে তপাকে! তপাই বা ভাবছে কি তাকে! হায়রে, ফেলুদা তো কোনদিন এরকম নিরাশ হয় নি। শুধু তার কপালেই । না! নতুন করে আবার অনুসন্ধান করতে হবে।

তপাকে ঝিকু বলে, "তোমাদের বাড়ীর চার পাশটা আর একবার ভালো করে খুঁজতে হবে তপা, আমার মনে হচ্ছে সেখানেই ক্লু পাব।"

"বেশ, চলো ঝিকুদা," কেমন যেন ম্রিয়মান হয়ে যায় তপা।

তপাদের বাড়ী আসতেই দোর গোড়ায় এবার দেখা পাওয়া গেল টুকির। চৌকাঠের কাছে দরজার কড়ার সঙ্গে বাঁধা রয়েছে টুকি। খুব আস্তে মিউ মিউ করে ডাকছে। তপাকে ফিরতে দেখে তপার মা বলে উঠলেন, এই যে, মেয়ের সকাল থেকে 'টুকি টুকি' বলে কান্না। এদিকে 'টুকি' সকালে পাশের বাড়ী গিয়ে তাদের রান্না করা মাছের ঝোলে মুখ ঢুকিয়ে বসে আছে। এখন ওরা টুকিকে দিয়ে বেশ কথা বলে গেল। আজ সারাদিন টুকির খাওয়া বন্ধ। এই দোর গোড়ায় বসে থাকুক।"

তপা আস্তে আস্তে দড়ি বাঁধা টুকিকে তুলে নেয় কোলে। তারপর ঝিকুকে বলে, "ঝিকুদা তুমি যদি আগে টুকিকে খুঁজে পেতে তাহলে হয়তো টুকিকে শাস্তি পেতে হতো না আজ।"

—"না তপা, আমি টুকিকে খুঁজতে আসি নি, টুকিকে যে নিয়ে গিয়েছিল, আমি তাকেই খুঁজতে এসেছিলাম।"

গট গট করে ঘর থেকে বেড়িয়ে আসে ঝিকু। কি জানি, বেরোনোটা দোর মলুকতা হলো কিনা।

ইউক্যালিপটাস

অশেষ রায়

ইউক্যালিপটাস— গাছটাকে নিয়ে কতই না বিভ্রান্তি। এ নাকি জল শুষে নিয়ে খরা ডেকে আনে, আঘাত হানে প্রাকৃতিক ভারসাম্যে...সত্যি কি তাই? অল্প কথায় যুক্তি-সাপেক্ষে তারই আলোচনা করা হল আর খানিক পরিচিতিও দেওয়া হল গাছটার।

'শুনেছিস ভাই, কিছু লোকে বলছে যে— আমরা নাকি আমাদের শিকড় দিয়ে মাটির ভেতর থেকে প্রচুর জল শুষে নিই, ডেকে আনি খরা। আমরা নাকি ওদের সামান্যই উপকারে আসি। এজন্য কিছু লোক ঠিক করেছে সমূলে বিনষ্ট করবে আমাদের।'

—'তা হলে কি হবে?'

—'কি আর হবে বল —মিথ্যে বুলি আওড়ে ওরা আমাদের চিরতরে লোপ করবে, পরে চাপড়াবে কপাল।'

কথাগুলো বলছিল এক ইউক্যালিপটাস তার এক স্বজাতীয় বন্ধুকে। কথোপকথনটি কাল্পনিক হলেও বাস্তবে কিন্তু এই ধারণার বশবর্তী হয়ে অনেক ব্যক্তিই জেহাদ ঘোষণা করছেন এই বৃক্ষটির বিরুদ্ধে। কিন্তু সত্যিই কি এরা বেশী জল শোষণ করে, সত্যিই কি এরা খরা ডেকে আনে কিংবা অন্য গাছের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়? এ প্রশ্নের উত্তর না হয় একটু পরেই জানা যাবে, তার আগে এসো গাছটাকে একটু চিনে নেওয়া যাক।

'ইউক্যালিপটাস' (Eucalyptus)—এই হল এদের ইংরেজী তথা চলতি নাম। এদের গণগত নামও এই। এরা **মিরটেসিয়া** (Myrtacea) পরিবারের গাছ। মোট প্রায় **ছ'শ** রকমের ইউক্যালিপটাস প্রজাতির দেখা মেলে পৃথিবীর আনাচে-কানাচে। তবে এদের আদি বাসভূমি হল অস্ট্রেলিয়া। আকৃতি ও প্রকৃতিগতভাবে এরা হয়ে থাকে এক-এক রকমের। এদের কেউ বা লম্বায় হয়ে থাকে এক মিটার আবার কেউ কেউ এক'শ মিটারও হয়। এদের পাতাগুলো হয়ে থাকে প্রধানতঃ সরু ও লম্বা। ইউক্যালিপটাস শব্দটির আভিধানিক অর্থ করলে দাঁড়ায়—**আই কভার ওয়েল**। গাছটির নাম ইউক্যালিপটাস হওয়ার কারণ পুষ্প আবরকের প্রকৃতি।

ইউক্যালিপটাস গাছের প্রধান শিকড়গুলো মাটির **মাত্র দু'মিটার গভীরে যায়।** ভূগর্ভস্থ জলের স্তর পর্যন্ত এই শিকড়গুলো পৌঁছায়ই না। অতএব এরা বেশী জল টানবেই বা কি করে? তাই ইউক্যালিপটাস বিরোধী যে অপপ্রচার হচ্ছে তা পুরোপুরি ভুল ধারণার উপর ভিত্তি করেই। ইউক্যালিপটাসের মাত্র দু'টি প্রজাতি আছে যাদের কিনা জল শোষণ ক্ষমতা একটু বেশী। এরা হল রোবাস্টা ও রস্ট্রাটা।

ইউক্যালিপটাস গাছ আমাদের নানা উপকারে আসে। এ গাছের কাঠ জ্বালানীর চাহিদা মেটাতে দারুণ কার্যকরী। এছাড়া খুঁটি হিসেবে, নৌকো তৈরী করতে, কাঠ কয়লা বানাতেও এ গাছের কাঠ ব্যবহৃত হয়। ইউক্যালিপটাসের পাতা সেদ্ধ করে খুব মূল্যবান তেল পাওয়া যায়। যার নাম—'ইউক্যালিপটাস অয়েল'। সর্দি —কাশিতে এর ব্যাপক ব্যবহার আছে। এছাড়া ইউক্যালিপটাস ফুলের নেকটার ও পরাগ মৌমাছিদের খুবই প্রিয়। বিজ্ঞানীদের মতে ইউক্যালিপটাসের ফুলের নেকটার থেকে মৌমাছিদের তৈরী মধু পৃথিবীর যে কোন উদ্ভিজ্জ খাদ্যের চেয়ে অনেক গুণে ভাল। বিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণে ও পরীক্ষায় আরো জানা গেছে, যে ইউক্যালিপটাস মাটির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি করতেও সহায়ক।

ইউক্যালিপটাসের বহুমুখী উপকারিতার দিকে চেয়ে দেশ-বিদেশে ব্যাপকহারে রোপণ করা হচ্ছে এই গাছ। আশা করা যায় যে, সমস্যাময় পৃথিবীর কিছু সমস্যার সমাধান হয়তো হবে এই গাছের দ্বারাই।

মহা ফ্যাসাদে পড়েছেন নকড়ি সামন্ত। অথচ ফ্যা'সাদের কথাটা বলতেও পারছেন না। এটা সম্পূর্ণ নিজের ব্যাপার। ভুল যদি হয়ে যাকে নিজেরই হয়েছে। কেন না, অংকের নিয়মে, আইনের বিচারে চুলচেরা বিশ্লেষণ করে দেখেছেন, চেয়ার থেকে ওঠেন নি তিনি। বসে লিখছিলেন। অথচ তারই মধ্যে হাতের কলমটা উধাও।

বাঘা উকিল নকড়ি সামন্ত। সবাই বলে বসিরহাট কোর্টে এমন উকিল কোনদিন আসেনি, আসবেও না।

নকড়ি সামন্ত যেন জীবন্ত আইন। কোর্টে দাঁড়ালে হাকিম অব্দি থতমত খেয়ে যান।

চড়া মেজাজের মানুষ নকড়ি সামন্ত। পান থেকে চুন খসলে আর রক্ষে নেই। চেঁচিয়ে বাড়ি মাত করবেন। সে এমন চেঁচামেচি, পোষা পায়রা-গুলো অব্দি ডানা ঝাপটে উড়ে যায়। কুকুরগুলো ডাকতে আরম্ভ করে। সেই সময় কারোরই সাহস হয় না সামনে এসে দাঁড়াতে। একমাত্র ব্যতিক্রম তুখোড় নাতি ডাকু। তার দাদুর চিৎকার শুনলেই সে ছুটে আসবে। হয়তো বলবে, তুমি অমন বাঘের মতো গর্জন করো বলেই লোকে তোমাকে বাঘা উকিল বলে।

ডাকুর দিকে সময় সময় তেড়েও যান নকড়ি সামন্ত। কিন্তু গেলে কি হবে, ডাকু একমুখ হাসি নিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। হয়তো বলে, দাদু আর কেউ চিৎকার করলে তুমি সহ্য করতে পারো না, আর তোমার চিৎকার তুমি সহ্য করো কি করে।

খাঁটি উকিলের নাতির মতো কথা। নকড়ি সামন্ত চুপসে যান। তবু নাতির কাছে হার মানতে রাজী নন। বলেন, যা যা—ছোট ছেলে, ছোট ছেলের মতো থাকবি।

অন্য সময় কলম হারালে বাড়ি মাথায় করতেন নকড়ি সামন্ত! আজ কলমটা আচমকা উধাও হয়ে গেল হাত থেকে নিজেই বুঝতে পারছেন না কি হলো।

বসে বসে ভাবলেন নকড়ি সামন্ত। না, চেয়ার ছেড়ে কোথাও ওঠেন নি তিনি। বসে আরজি লিখছিলেন। একটা জটিল মোকদ্দমার আরজি। তাছাড়া ঘরে কেউ ছিলও না। এমন কি কুকুর

বিড়ালও ঘরে ঢোকেনি। তাহলে কলমটা যাবে কোথায়।

আর কলমটা উধাও হতে মাথাটাও গরম হয়ে উঠলো। একটা চিন্তা নিয়ে আরজি লিখছেন—এখন কলমের উধাও হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাও জট পাকিয়ে গেল।

মেজাজ বিগড়ে গেল। রক্ত এখন মাথায় উঠছে আস্তে আস্তে। প্রেসারও বাড়ছে। চিৎকার চেঁচামেচি করলে মেজাজের চাপা বাষ্প খানিকটা বেরিয়ে যায়—তা চেঁচাতেও পারছেন না। অথচ ইচ্ছে করছে ভয়ংকর ভাবে চিৎকার করতে—আমার কলম কোথায় গেল।

রাগে ফুলে ফুলে উঠছেন নকড়ি সামন্ত। টেবিলের নিচেও উঁকি দিয়েছেন—কলম নেই।

কলমটা যাবে কোথায়?

—নকড়ি সামন্ত নিজেকেই নিজে জেরা শুরু করলেন।

—আমি কি উঠেছিলাম?

—না।

—আমি কি নড়াচড়া করেছিলাম?

—না।

—আমি কি কলম দিয়ে পিঠ-টিঠ চুলকেছিলাম?

—না।

তাহলে কোথায় যাবে কলমটা।

আইনের পথ হাতড়ে দেখলেন নকড়ি সামন্ত। কিন্তু কলম উধাও হওয়ার কোনো সম্ভাব্য সূত্র পেলেন না।

শরীরের মধ্যে একটা যন্ত্রণা হচ্ছে নকড়ি সামন্তর। মাথাটাও কেমন ঘুরছে। অথচ একটু উঠলেই আর একটা কলম নিয়ে লিখতে পারেন, সে কথাটা একবার মনেও হলো না। অথচ পাশেই ওঁর সহকারীর টেবিলে কলমদানিতে কয়েকটা কলম রয়েছে। চোখের সামনে, অথচ চোখে পড়ছে না।

বুক চাপা নিঃশ্বাস ত্যাগ করে একটিপ নস্য নিলেন নকড়ি সামন্ত।

মাথাটা একটু ছাড়লো যেন। ঠিক করলেন আর ভাববেন না। কলমটা গেছে যাক। আর একটা কলম নিয়েই লিখবেন।

কিন্তু মন তো একটা নয়—দুটো। আর এক মন ভাবলো, না—ওই কলমটাই চাই। কলমটা গেলেই হলো?

ভাবনার এই মুহূর্তে ডাকু এলো।

এসেই দেখলো, দাদু গুম হয়ে বসে আছে। ভাবলো, নিশ্চয়ই একটা কিছু গোলমাল হয়েছে। এখন গ্যাস বেলুনের মতো ফুলছে, একটু পরেই ফেটে পড়বে।

ডাকুকে একবার দেখলেন এই পর্যন্ত, কিন্তু কোনো কথা বললেন না নকড়ি সামন্ত।

ডাকু এগিয়ে এলো, কী দাদু আইনের পথ খুঁজে পাচ্ছো না বুঝি?

দাদু হঠাৎ কেমন কাঁদোকাঁদো গলায় বলে উঠলেন, নারে ডাকু—আমার কলমটা হাত থেকে উধাও হয়ে গেল।

—তাই নাকি? ডাকু লক্ষ্য করলো দাদুকে। তারপর এদিক-ওদিক দেখলো। আবার তার দু-

চোখ ফিরে এলো দাদুর মুখে।

—কি হলো বল তো ডাকু?

ডাকু বললে, কোথাও রাখোনি তো?

—নারে, বসে লিখছিলাম—হঠাৎ উধাও।

ডাকুর মুখে হঠাৎ হাসির ঝিলিক। এবং তা লক্ষ্য করলেন নকড়ি। বললেন, ডাকু—আমার এই দুঃখের সময় তুই হাসছিস?

ডাকু বললে, কলমটা যাবে কোথায়? হয়তো তুমি মনের ভুলে কোথাও রেখেছো।

—না রে, অতো ভুল হয় না আমার?

—নিজের ভুল যদি নিজে বুঝতে পারবে মানুষ, তাহলে মানুষ ভুল করবে কেন?

কথার মতো কথা বলেছে ডাকু। নকড়ি মুখে কিছু না বললেও মনে মনে তারিফ করলেন।

—আচ্ছা দাদু, তুমি কি অন্যমনস্ক হয়েছিলে?

নকড়ি সামন্ত বললেন, তুই আমাকে জেরা করছিস কেন?

—দেখি যদি কলম হারানোর কোনো সূত্র পাওয়া যায়।

—আরে হারায়নি, কোথায় হারাবে—আমি তো কোথাও যাইনি।

—তুমি ভালো করে ভেবে ছাখো।

—আর কতো ভাববো বল তো?

—এক টিপ জবর করে নস্য নাও—পারো তো নাকে কাঠি দিয়ে হাঁচো—ছাখো মাথা সাফ হলে মনে পড়ে কিনা।

নকড়ি সামন্ত বেশ বড়ো করে একটিপ নস্য নিলেন। নাকে কাঠি দিয়ে হাঁচতে হলো না। নস্যের দাপটেই মোক্ষম হাঁচি এলো। হাঁচির সঙ্গে সঙ্গে কানের ওপর থেকে কলম ছিটকে পড়লো টেবিলের ওপর।

ডাকু বললে, ওটা তোমার কানের ওপর গোঁজা ছিল।

নকড়ি সামন্ত হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠলেন। ডাকুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, ডাকু—সত্যিই আমি অন্যমনস্ক হয়েছিলাম।

হাতেখড়ির লেখা ভালো লাগুক বা না লাগুক চিঠি চাই। বহু প্রখ্যাত শিল্পী-সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী এই পত্রিকার সঙ্গে জড়িত। কয়েক-সংখ্যার পরেই যাঁরা ছদ্মনামে লিখছেন তাঁদের পরিচয় দেওয়া হবে। পত্রিকা কিভাবে আরও ভালো করা যায় সে সম্বন্ধে লেটার-বক্স-ওপচানো চিঠিপত্র চাই।

—যোগাযোগ স্থান—

—আমাদের প্রেস—

৮৩, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

(দূরভাষ : ৩৫-৮৯৮৪)

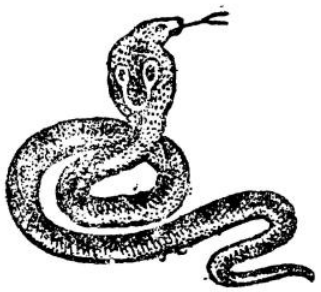

সাপ

বিকাশকান্তি সাহা

বর্ষার মেঘ গুরু গুরু আওয়াজে ডাকতে শুরু করে দিয়েছে, তার সাথে তাল মিলিয়ে ময়ূর তুলেছে পেখম, ব্যাঙ ডাকছে গ্যাঙর গ্যাঙ্ রবে। আর এই সুযোগে সাপেরা গর্ত ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে হেলতে দুলতে। বাংলার গ্রাম হচ্ছে সাপেদের প্রিয় আখড়া। আর এই সাপ নামক প্রাণীটাকে ঘিরে শিশু থেকে বুড়ো সবেরই আছে বিস্ময়। শীত আসতে অনেক বাকী। এসো, এই সুযোগে কিছু জেনে নিই সাপ নামক এই সরীসৃপটা সম্বন্ধে।

যারা শহরে থাক তাদের কথা ছেড়েই দিলাম; কিন্তু তোমরা যারা গ্রামে থাক তাদের যদি জিজ্ঞেস করা হয়, 'তোমাদের অঞ্চলে কি কি সাপ আছে? শুনতে খারাপ লাগলেও কথাটা খুবই সত্যি যে, তোমরা গুটিকয়েক সাপের নাম বলেই আমতা আমতা করতে থাকবে। আর যাও বা বলবে তাও একটার নাম অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে একেবারে জগাখিচুড়ি বানিয়ে ফেলবে। তোমাদের অনেকেরই ধারণা দু'একটা সাপ ছাড়া বাকী সবাই বিষধর। প্রথমেই বলি বিষকে শ্রেণী বিভাগের মাপকাঠি হিসেবে ধরে সাপকে প্রধানতঃ তিনভাগে ভাগ করা যায়। এক, উগ্রবিষ সাপ; দুই, ক্ষীণবিষ সাপ; তিন, বিষহীন সাপ। উগ্রবিষ সাপে কামড়ালে মানুষের শরীরে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এবং মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে। ক্ষীণবিষ সাপের কামড়ে মানুষের প্রায় কিছুই হয় না। অল্প যা বিষক্রিয়া হয় তা সাধারণ চিকিৎসাতেই সারানো সম্ভব। আর বিষহীন সাপের কামড়ে কিছুই হয় না। কাঁটা ফুটলে যেমনটি হয় ঠিক তেমন অনুভূতিই হয় বিষহীন সাপের কামড়ে।

ভারতবর্ষে প্রধানতঃ চার গোষ্ঠীর সাপ বিষধর। এরা হল কোবরা (Cobra), ক্রেইট (Krait), ভাইপার (Viper) ও সি স্নেক (Sea Snake)। কোবরা গোষ্ঠীতে আছে গোখরো, কেউটে ও শংখচূড়; ক্রেইট গোষ্ঠীতে আছে কালাজ ও শাঁখামুটি; ভাইপার গোষ্ঠীতে চন্দ্রবোড়া ও ফুরসা; সি স্নেক গোষ্ঠীতে আছে সব সমুদ্র সাপ। এইসব সাপেদের মধ্যে আমাদের পশ্চিমবাংলার লোকেরা গোখরো, কেউটে, কালাজ ও চন্দ্রবোড়া এই ক'টির কামড়েই মারা যান। শংখচূড় জঙ্গলে থাকে,

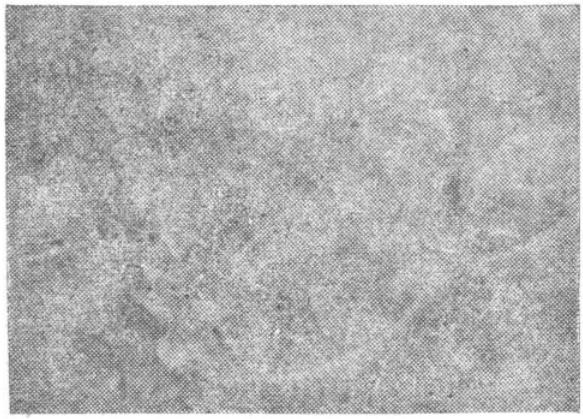

সমুদ্র সাপ থাকে সমুদ্রে, অতএব এদের কামড়ের সম্ভাবনাও অনেক কম। শাঁখামুটির মারাত্মক বিষ হলেও এতই বোকা ও অলস সাপ যে এরা কাউকে কামড়ায় না। শুনলে অবাক হবে শাঁখামুটির কামড়ে মৃত্যুর কোন প্রামাণ্য তথ্য পৃথিবীর কোথাও নেই। আর ফুরসা সাপ পশ্চিম বাংলায় নেই; এদের বেশী দেখা মেলে দক্ষিণ ভারতে।

এবার তাহলে বুঝলে তো যে, মাত্র চারটে সাপের কামড়েই মৃত্যুর সম্ভাবনা বেশী থাকে। এই চারটে সাপকে বহিরাগত বৈশিষ্ট্য দেখে কিভাবে চিনবে তার কিছু প্রাথমিক ও সহজ উপায় বলছি। যদি ফণা তোলে তাহলেই ধরে নেবে কোবরা গোষ্ঠীর সাপ। ফণার উপরে

যদি গরুর ক্ষুরের মতো চিহ্ন থাকে তবে তা গোখরো; আর যদি চিহ্নটা গোলাকার হয় তবে তা কেউটে। চন্দ্রবোড়া চিনতে হলে, দেখবে মাথাটা তেকোণা কিনা, সারা গায়ে শিকলের মতো চাকা চাকা দাগ আছে কিনা? এদের দেহটা বেশ মোটাসোটা আর গায়ের রং পাটকিলে বাদামী। কালাজ সাপ চিনতে হলে প্রথমেই নজর দিতে হবে গায়ের রং-এর দিকে। গায়ের রং যদি নীলচে কালো হয়, তার উপরে সারা শরীর জুড়ে প্রায় চল্লিশ জোড়া আড়াআড়ি ভাবে সাদা ব্যাণ্ড থাকে তবে তা কালাজ (অবশ্য অঞ্চল ভেদে গায়ের রং-এর পার্থক্য দেখা যেতে পারে)। তবে অনেকেই কালাজের সাথে ভুল করে বসে ঘর চিতির। আমরা যদি বিষধর সাপেদের চিনতে পারি তবেই কিন্তু সব ঝামেলা চুকে যায় আর সেই চেষ্টাই আমাদের প্রথমে করা উচিত।

পরিচিত কিছু সাপ

ভাল নাম	আঞ্চলিক নাম	ইংরেজী নাম
গোখরো	তক্ষ, তেঁতুলে গোখরো, খরিশ	Binocled Cobra
কেউটে	কেউটিয়া, আলকেউটে	Monocled Cobra
শংখচুড়		King Cobra
শাঁখামুটি	শঙ্খিনী, দোমুখো শাখিনী	Banded Krait
চন্দ্রবোড়া	বোড়া, দুধে বোড়া	Russell's Viper
হেলে	হলহলিয়া, হুর-হুররা	Stripped Keel Back
পুঁয়ে	অন্ধসাপ, পুঁইয়া দোমুখো	Blind Snake
জলঢোঁড়া	জলগেঁটে	Checkered Keel Back
ঢ্যামন	দাঁড়াশ, ঢ্যামনা	Rat Snake
মেটেলী	মাটলে	Olive Keel Back Water Snake
কালনাগিনী		Ornamental Snake
লাউডগা		Vine Snake
ঘরচিতি	চিতি বোড়া	Wolf Snake
নোনাবোড়া	জাল কাটা সাপ	Dog-faced Snake

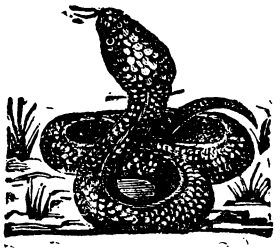

মজাদার সর্প সন্দেশ

- সাপেরা শুনতে পায় না, কিন্তু এরা মাটির কম্পন অনুভব করে অন্যের উপস্থিতি বুঝতে পারে।
- সাপেদের চেরা জিভ দারুণ সংবেদনশীল। এই চেরা জিভ দিয়েই এরা মাটি থেকে ঘ্রাণ নেয়।
- সব সাপেরই গা শুকনো এবং পরিষ্কার।
- সব সাপই খুব ভাল সাঁতারু।
- সব স্থলবাসী সাপই গাছে উঠতে পারে এবং বেশ কয়েক প্রজাতির সাপ আছে যারা পুরোপুরি বৃক্ষবাসী।
- এরা বছরে বেশ কয়েকবার খোলস ছাড়ে।
- সাপ কখনোই স্থির বস্তুর উপর ছোবল মারে না।
- একমাত্র শংখচূড় সাপই নিজের বাসা নিজে বাঁধতে পারে।
- সাপেরা সাধারণতঃ ডিম পাড়ে। কিন্তু চন্দ্রবোড়া, লাউডগা ইত্যাদি সাপ সরাসরি বাচ্চা প্রসব করে।
- কিছু কিছু সাপ আছে যারা প্রধানতঃ সাপ খেয়ে থাকে। যেমন, শংখচূড়, শিয়রচাঁদা ইত্যাদি।
- সব পুরুষ সাপেরই জননাঙ্গ দুটো।
- সব সাপেরাই লাজুক ও ভীতু প্রাণী এবং এরা সাধারণতঃ মানুষ ও অন্যান্য বড় প্রাণীদের এড়িয়ে যেতে চায়।

কপিকল

অঞ্জলি রায়

বেশ একটু ফাঁকায় সিংদের পাকাবাড়ি। সামনে পিছনে মস্ত বাগান। ফলের গাছ প্রচুর। ডাঁসা পেয়ারা, কাঁচা আম আর পাকা কলায় কার না চোখ পড়ে।

ছোটদের 'ড্রিমল্যাণ্ড' সিংদের বাগান! হামেশাই ছোটদের ওখানে ঘুরতে দেখা যায়। দুঃসাহসী কেউ কেউ প্রাচীরেও চড়ে বসে। লোভের মাত্রা ছাড়ালে, কেউ আবার গাছেও উঠতে কসুর করে না। সিংদের বাড়ির লোক ভাল। ধরা পড়লে মারাত্মক কিছু গড়ায় না। একটু আধটু বকুনি, ব্যস ঐ পর্যন্ত। এতে আস্কারা পাচ্ছে ছোটরা, সাহস বাড়ছে চোরেদের।

একদিন সিংদের বাড়ির সবাই গেলেন পুজো দিতে। মন্দির দূরে—পুজোর ঘটা বেশি, তাই ফিরতে দেরি হবে। নাকের ডগায় সুযোগ, ফাঁকা ঘর। একটা ছিঁচ্‌কে চোরের জিবে জল এসে পড়ল। হাত তো নিস্‌পিস্‌ করছিল অনেকদিন থেকেই। চুপিচুপি এক ফাঁকে চোর উঠল প্রাচীরে। তারপর গাছ বেয়ে পৌছাল জানালার কাছে। সিংদের বাড়ি পুরোন, অনেক জায়গা ভাঙ্গা। জানালার শিক ধরে টানতেই খুলে গেল সহজে। পরপর দু'টো শিক সরিয়ে চোর ঢুকল ঘরে। ঘরটার দরজা ছিল বাইরে থেকে বন্ধ। ঘরে ঢুকে চোরের বুক ধড়ফড় করতে শুরু করল। পা তো আগে থেকেই কাঁপছিল। কি করবে দাঁড়িয়ে ভাবছে, এমন সময় একটা অস্বাভাবিক খ্যাসখ্যাস শব্দে চোরের পিলে চমকে উঠল। চোরের আবার দারুণ ভূতের ভয়। ছোটবেলা থেকেই চোরের ভূতে বিশ্বাস। শেষে চুরি করতে এসে অপদেবতার হাতে পড়ল নাকি? শব্দ লক্ষ্য করে চোর তাকিয়ে থাকল। বিস্ময়ে অবাক! এ যে বিশ্বাস করা যায় না! ঘরের উঁচু তাকে এক বাঁদর বাচ্চা বসে। মুখ ভেঙাচ্ছে, না দাঁত খিঁচোচ্ছে বোঝা দায়।

অপদেবতার খপ্পরে নয়, চোর তবে বাঁদরের পাল্লায় পড়ল? এই মুহূর্তে ভূত ভাল না বাঁদর ভাল চোর হিসাব করতে পারল না। গোবেচারা মুখ করে, চোর বাঁদরের দিকে মিটমিট করে তাকাতে লাগল। উটকো বাঁদর বাচ্চা ফাঁকা ঘরে কোন রকমে ঢুকে পড়ছে, এক্ষুণি বেরিয়ে যাবে, চোর ভাবল। বাঁদরটাও চোখ পিটপিট করে তাকাচ্ছে। তারপর কি মনে করে এক-লাফে এসে বসল জানালার পাল্লায়। হাওয়া খেতে না পাহারা দিতে কে জানে। একে বাঁদর, তায় বাচ্চা, বাঁদরামির মাত্রা ছাড়াবে কিনা কে বলতে পারে?

লম্বা ল্যাজ দুলিয়ে বসার ধরন দেখে বাঁদরটার চলে যাবার লক্ষণ প্রকাশ পেল না। হাতের কাছে এমন একটা কিছু পাওয়া যাচ্ছে না, যা দিয়ে বাঁদরটাকে হেটহাট করা যায়। বাঁদরটাকে বশ মানাতে পারলে মোটামুটি মন্দ হ'ত না। আয় আয় চুকচুক করে চোরটা আস্তে বার দু'য়েক বাঁদরটাকে ডাকল। কিন্তু তাতে কোন ফল হ'ল না। উল্টে বাঁদরটা খ্যাঁকখ্যাঁক করে দাঁত বের করল। ভয় পেয়ে চোর বাবাজীর ভিরমি খাবার যোগাড়। এ.কোন গড়ে বন্দী হ'ল সে? একদিকে দরজা বন্ধ, অন্যদিকে জানালায় বসে তিড়বিড়ে বাঁদর।

হঠাৎ ঘরের মাথায় টাঙ্গান প্রকাণ্ড কলার কাঁদির ওপর চোখ পড়ল চোরের। ব্যস এই তো, কলা দিয়ে কলা দেখান যাবে বাঁদরকে। কিন্তু কলার কাঁদি যেখানে, সেখানে হাত ঠেকাতে গেলে উঠতে হবে উঁচুতে। একটা টেবিল আছে বটে। ওরই 'পর ওঠা যাক্। লাফ দিয়ে উঠতে আর কি? চোর লাফ দিতে ওস্তাদ। যেমন ভাবা তেমনি কাজ। অন্যদিকে চোরকে নিজের মত লাফাতে দেখে বাঁদরটা তো অবাক। কিন্তু গোল বাধল তক্ষুণি, যখন চোর গেল কলার কাঁদিতে হাত দিতে।

তার বরাদ্দ কলার কাঁদিতে হাত? এরপর বাঁদরটা চুপ্ করে থাকে কি করে? তড়াক করে লাফ দিয়ে সে চোরের গলা জড়িয়ে ধরল দু'হাতে। চোর কলা ছেড়ে, গলা ছাড়াতে হিম্-সিম্। টেবিলে দাঁড়িয়ে জড়াজড়ি করার চেয়ে, নিচে গড়াগড়ি যাওয়ার ঢের সুবিধে। পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কম। চোর টেবিল ছেড়ে নিচে নামল। বুদ্ধিমান বাঁদর সেই মওকায় চোরের গলা ছেড়ে পতনের হাত থেকে বাঁচাতে, চোরের চুলের মুঠি ধরেছে আঁকড়ে। হাঁই-ফাঁই করতে করতে চোর বেচারী একবার ওঠে, একবার বসে। কিন্তু নাছোড়বান্দা বাঁদর, খাম্চে ধরে আছে চুলের গোছা। ছাড়লে তো ছাড়াবে? শেষে বাঁচার আশা জলাঞ্জলি দিয়ে, ওই গন্ধমাদন ঘাড়ে করেই চোর মাটিতে ধপাস্ করে বসে পড়ে। এতক্ষণ সুস্থির হ'য়ে বসতে পেরে বাঁদর বাবাজীও হাঁপ্ ছেড়ে বাঁচে। নজর চালিয়ে চোরের লম্বা চুলে নখ দিয়ে খুঁটে খুঁটে উকুন খায়। টানের চোটে একে মাথায় জ্বালা ধরে ছিল, এখন খোঁচানির চোটে ব্রহ্মতালু পর্যন্ত টন্‌টনিয়ে উঠল। কিন্তু উপায়?

উপায় নাস্তি। ভূতের পাল্লায় কে পড়েছে কে জানে? ভূতুড়ে কাণ্ড চোর কখনো চোখে দেখিনি। এখন বাঁদরের কব্জায় পড়ে চোর চিঁচিঁ ডাক্‌ছে। উকুন শেষ করে বাঁদর বসল চোরের ঘামাচি মারতে। তপ্ত খোলায় খই-এর মত চোরের গায়ে ঘামাচি ফুটেছে। বাঁদর তাই মারতে বসল, ঘাড় থেকে নেমে। পটপট ঘামাচি মারে আর একটু নড়লেই চটাপট্ চাপড় বসায় চোরের পিঠে। মাথায় জ্বালা, পিঠে রক্তারক্তি কাণ্ড, সেই সঙ্গে চড়চাপড়—কত আর সয়? চোর বুঝল চুরি করতে এসে বাঁদরের হাতেই তার এ জন্মের খেলা শেষ!

কিন্তু আশা যায় না জলে। হঠাৎ একটা পাকা কলা ছিঁড়ে পড়ল মাটিতে। কলা দেখে পিঠ ছেড়ে বাঁদর ছুটল সেইদিকে। এই সুযোগ, চোর ভাবল জানালা দিয়ে পালাবে। কিন্তু সে

গুড়ে বালি! চোর উঠেছে, কি, ওঠেনি বাঁদর এসে বসিয়ে দিল টেনে। নিরুপায় চোর বসে মাটিতে। এদিকে দাপাদাপি করে বাঁদরটার বোধহয় পেট জ্বলছিল। কয়েকটা কলা পেড়ে নিয়ে তাই ছাড়িয়ে খেতে বসল মাটিতে। আড়-চোখে চোরকে দেখে, আর খোসা ছুঁড়ে মারে। বিপদ এলে লড়ি, নইলে গলায় দড়ি—শ্লোকটা চোরের জানা। লড়তে কি সে বাকী রেখেছে? গলায় দড়ির কথা ভেবে চোরের গলা ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করে। গভীর শোকে চোরের মনে শ্লোকের জোয়ার বয়ে যায়। ভাবে বুদ্ধি আছে যার, সেই পেয়েছে পার—কিন্তু এখানেও পার পাবার উপায় নেই। পারাপারে ওস্তাদ হনুমানজীর বংশধর তো ঐ বিচ্ছু বাঁদরটা, ওকে পেরুতে দিলে তো? যে জানালা ভেঙ্গে ঢুকেছে, সে খোলা জানালা টপকাতে পারবে না? হাল ছেড়ে চোর যেই ঘুরেছে, তখনই হঠাৎ সে একটা কাণ্ড করে বসল। মাটিতে বেড় দিয়ে পড়ে থাকা বাঁদরের লম্বা ল্যাজটা দু'হাতে খপ্ করে ধরে, হেঁইও বলে দিল টান। ল্যাজের টানে বীর হনুমান চিৎপটাং, আর কে পায়? চোর তো পাঁইপাঁই করে ল্যাজ ধরে ঘোরে।

পেছনের দিকে চোর, বাঁদর কি করে? চোরকে সামনে পেলে তো বুঝবে। কে সাধ করে বাঁদরের সামনে আসে? ল্যাজের দিক্ ঢের ভাল, আঁচড়ানোর, কামড়ানোর ঝামেলা নেই, টেনে রাখলেই ল্যাঠা চুকে গেল।

কিন্তু বাঁদর? সে এই অপমান সইবে?

ল্যাজেই বাঁদরের সব ঐতিহ্য। ল্যাজের আগুনেই না লঙ্কা পুড়িয়েছিল? সেই ল্যাজে হাত? ছিঁড়ে যাবে না কে বলতে পারে? তখন মুখ দেখাবে কি করে? ল্যাজবিহীন বাঁদর আর শূয়োর একই কথা।

এসব কথা বাঁদর ভাবুক্ আর নাই ভাবুক্ টানের চোটে ল্যাজের গোড়ায় আগুন জ্বালিয়ে মারল বাঁদরকে।

সুযোগ বুঝে এক লাফে চোর উঠল টেবিলে। বঁড়শীতে মাছ গাঁথার মত ল্যাজ ধরে একেবার বাঁদরকে ওপরে তুলে খেলিয়ে নিয়ে বসিয়ে দেয় মাটিতে। বাঁদর শূন্যে হাত পা দুলিয়ে মাটিতে এদিক ওদিক করে।

চোর শক্ত হাতে টেনে রাখে ল্যাজ।

এমনি যখন টানা পোড়েন চলছে চোরে-বাঁদরে, তখন ঘটাং করে দরজা খোলার শব্দ হ'ল বাইরে।

ঘরের মধ্যে বাঁদরের ল্যাজ ধরে একজন অপরিচিত লোককে দেখে বাড়ির মালিক অবাক।

—'কি ব্যাপার?'

এবার জানপ্রাণ যায় বুঝে চোর বাঁদরের ল্যাজ ছেড়ে হাতজোড় করে। এতক্ষণ বিপাকে পড়ে ল্যাজ টানার অপমান সহ্য করছিল বাঁদর। ল্যাজ মুক্তির পরই সে তার শোধ তুলল তক্ষুণি। চোরের গালে ঠাস করে চড় মারল জোড়া হাতে।

চোর টেবিল থেকে লাফিয়ে পায়ে পড়ল মালিকের।

মালিক বাঁদরকে দূরে সরিয়ে বললেন, 'চুরি করতে এসে কপিকলে পড়েছ বাছাধন?'

—'কপিকল?'

—'কপিকল জান না? রামচন্দ্র তাঁর কপিসেনা নিয়েই তো লঙ্কা জয় করেছিলেন? লালি আমার পোষা বাঁদর, চোর ধরতে ওস্তাদ।'

—'থানা পুলিশ যাই করুন, আপনার কপি-সেনার হাত থেকে আমাকে বাঁচান। বাঁদরের আঁচড়ানির চেয়ে পুলিশের ঠ্যাঙানি ঢের ভাল।'

চোরের কথায় মালিক হো হো করে হেসে ওঠেন।

পরিবেশ

বৃষ্টির জল কি সত্যিই জীবাণু মুক্ত

বর্ষা শুরু হয়ে গেছে। এই সময় বৃষ্টিতে ভিজতে কিই না মজা—বল ? আমাদের সবার মধ্যে একটা বিশ্বাস আছে যে বৃষ্টির জলই সবচেয়ে বিশুদ্ধ জল। সত্যিই কি তাই ? এসো বৃষ্টির জলে গা ভেজাবার আগে টুক করে জেনে নিই এর গূঢ়সত্য ॥

বিকাশকান্তি সাহা

বৃষ্টির জল—কতই না এর সুখ্যাতি। ঠাকুমা-দিদিমারা বলেন এ একেবারে শুদ্ধ (Sterile) জল। আবার শিলাবৃষ্টি হলে তো কথাই নেই। ছোটদের মধ্যে পড়ে যায় হুড়োহুড়ি শিল কুড়োবার জন্যে। তার পর কপাকপ মুখে পুরে শুরু হয় আনন্দের হিল্লোল। এই যে বৃষ্টির জল, যাকে কি না আমরা বিশুদ্ধ জল হিসেবে জানি শুনলে অবাক হবে যে এর বিন্দুমাত্রও কিন্তু বিশুদ্ধতার ধ্বজা ধরে থাকে না।

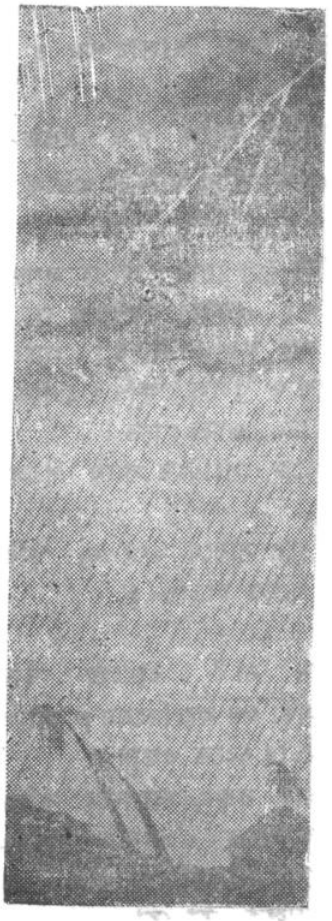

নিশ্চয়ই প্রশ্ন করবে—এতো আকাশ থেকে পড়ে, এ জল কেন শুদ্ধ হবে না ? হ্যাঁ এ প্রশ্নের উত্তর জানতে এসো একবার চোখ ফেরানো যাক

পরিবেশ দূষণের ভারে জর্জরিত আমাদের বর্তমান পৃথিবী— এ কথা নিশ্চয়ই কারো অজানা নয়। বায়ুমণ্ডল আজ নানা দূষিত গ্যাস, শিল্পাঞ্চলের ধোঁয়া, মোটর গাড়ী নিঃসৃত নানা ক্ষতিকারক গ্যাসীয় পদার্থ, নানা গুঁড়ো জিনিসে ভরা।

বৃষ্টি যখন পড়ে তখন এসবকে সাথে নিয়ে আসে।

এছাড়া বায়ুমণ্ডল হল নানাধরণের **রোগজীবাণুর** আকর।

যখন বৃষ্টিপাত হয় এই **রোগজীবাণুরাই বৃষ্টির জলকে অশুদ্ধ (Non Sterile) করে ছাড়ে।**

জীববিজ্ঞানের আঙ্গিকে বলতে গেলে, বায়ুমণ্ডলে মেঘের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে প্রোটোজোয়া, ব্যাকটিরিয়া, ফুলের রেণু ইত্যাদিরা। বৃষ্টি যখন নামে তখন এসব জিনিসই বৃষ্টির জলে বর্তমান থাকে বেশ ভালো পরিমাণে।

বৃষ্টির জল—সে যেখানেই পড়ুক না কেন, কি সমুদ্রে, কি মেরুদেশে, কি মাটিতে এতে থাকবেই। তবে দেখা গেছে বন বা তৃণভূমি অঞ্চলের বৃষ্টিপাতের জলের থেকে শহরের বৃষ্টিপাতের জলে অনেক বেশীসংখ্যক জীবাণু বর্তমান। কোন বড় শহরে বৃষ্টিপাতের সাথে বছরে প্রতি বর্গমিটার অঞ্চলে প্রায় **পাঁচ মিলিয়ন আণুবীক্ষনিক জীবাণুর** পতন হয়। পর্যবেক্ষণে আরো জানা যায় যে, বৃষ্টিপাতের শুরুতেই ব্যাবটিরিয়ার উপস্থিতির হার বেশী থাকে।

বিভিন্ন সময়ে বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন উচ্চতা থেকে বৃষ্টিপাত হয়। তবে সবসময়ই মেঘের নিম্নবর্তী স্তরে অবস্থানকারী রোগজীবাণুরাই বৃষ্টির জলের সাথে মেশার সুযোগ পায়।

তুষারপাতের বরফের জলে বৃষ্টির জলের চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে জীবাণু থাকে। আবার তুষারপাতের বরফের থেকেও শিলাবৃষ্টির শিলাতে এর পরিমাণটা আরো বেশী। তুলনামূলক হিসেবে জানা যায় যে, **প্রতি গ্রাম তুষারপাতের তুষারে ৫০০ জীবাণু ও প্রতি গ্রাম শিলাতে প্রায় ২০,০০০ জীবাণু** থাকে। তোমরা যারা শিলাবৃষ্টির শিলা খেয়ে থাক, তারা এখন নিশ্চয় বুঝছ তো কত জীবাণু গলাধঃকরণ কর—না জেনে শুনে। তবে **উঁচু পাহাড় এবং তুষারবাহের তুষার সত্যিই জীবাণুমুক্ত।**

বৃষ্টিপাতের পর ভেজামাটিতে জীবাণুগুলো আবর্জনার মতো স্তূপাকৃতি অবস্থায় থাকে। এখানে এবসব জীবাণুর স্পোরগুলো অংকুরিত হয় এবং পরে বাতাসের সাথে শুকনো স্পোরগুলো ঘুরে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে।

রোগ ছড়াতে জীবাণুর ভূমিকা।

বৃষ্টির জলের সাথে যে সমস্ত জীবাণুর পতন ঘটে তারা বাস্তুতন্ত্রে (Ecosysten) দারুণ ক্ষতিকারক প্রভাব টেনে আনে। এইসব জীবাণু গাছেদের ক্ষেত্রে নানা রোগসৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ক্ষেত্রে নানা শ্বাসজনিত রোগেরও কারণ এইসব জীবাণু। 'হুইট রাস্ট' নামক গমের একজাতের ছাতা ধরা রোগের হিমালয়, নীলগিরি, পুলনি ইত্যাদি পার্বত্য অঞ্চলে দারুণ প্রকোপ দেখা দেয়। অনুসন্ধানে জানা যায় যে, বৃষ্টির জলের সাথে বাহিত বিভিন্ন জীবাণুই এই রোগের কারণ। ব্রাউন ও ব্ল্যাক রাস্ট রোগের বাহকও এই বৃষ্টির জল—সাম্প্রতিক এক অনুসন্ধানে জানা যায়। বৃষ্টির জলের জীবাণু পশুদেরও বিভিন্ন রোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন গরু, মোষ, ভেড়া ইত্যাদি প্রাণীর পা ও মুখের ঘা এইসব জীবাণুর দ্বারা সংক্রামিত হয়।

পুরাতনী—

চল নামি—আষাঢ় আসিয়াছে—চল নামি। আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃষ্টিবিন্দু, একা একজনে যুথিকাকলির শুষ্ক মুখও ধুইতে পারি না। মল্লিকার ক্ষুদ্র হৃদয় ভরিতে পারি না। কিন্তু আমরা সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি কণা মনে করিলে পৃথিবী ভাসাই। ক্ষুদ্র কে?

দেখ, যে একা সে-ই ক্ষুদ্র, সেই সামান্য। যাহার ঐক্য নাই, সেই তুচ্ছ। দেখ ভাই সকল, কেহ একা নামিও না—অর্ধপথে, ঐ প্রচণ্ড রবির কিরণে শুকাইয়া যাইবে—চল, সহস্রে সহস্রে, লক্ষে লক্ষে অর্বুদে অর্বুদে, এই বিশোষিত পৃথিবী ভাসাইব।

পৃথিবী ভাসাইব। পর্বতের মাথায় চড়িয়া, তাহার গলা ধরিয়া, বুকে পা দিয়া পৃথিবীতে নামিব; নির্ঝর পথে স্ফটিক হইয়া বাহির হইব। নদী কূলের শূন্যহৃদয় ভরাইয়া তাহাদিগকে রূপের বসন পরাইয়া মহাকল্লোলে ভীমবাদ্য বাজাইয়া, তরঙ্গের উপর মহারঙ্গে ক্রীড়া করিব। এস সবে নামি।

কে যুদ্ধ দিবে—বায়ু? ইস্! বায়ুর ঘাড়ে চড়িয়া দেশ-দেশান্তরে বেড়াইব। আমাদের এ বর্ষাযুদ্ধে বায়ু ঘোড়া মাত্র, তাহার সাহায্য পাইলে স্থলে জলে এক করিব। তাহার সাহায্য পাইলে বড় বড় গ্রাম অট্টালিকা স্রোতের মুখে করিয়া ধুইয়া লইয়া যাইব। তাহার ঘাড়ে চড়িয়া, জানলা দিয়া লোকের ঘরে ঢুকিব। বায়ু! বায়ু ত আমাদের গোলাম।

দেখ ভাই, কেহ একা নামিও না—ঐক্যেই বল—নইলে আমরা কেহ নই! ক্ষুদ্র আমরা বৃষ্টিবিন্দু, কিন্তু পৃথিবী রাখিব। শস্যক্ষেত্রে শস্য জন্মাইব—মনুষ্য বাঁচিবে। নদীতে নৌকা চালাইব—মনুষ্যের বাণিজ্য বাঁচিবে। তৃণ-লতাবৃক্ষাদির পুষ্টি করিব—পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ বাঁচিবে। আমরা ক্ষুদ্র বৃষ্টিবিন্দু—আমাদের সমান কে? আমরাই সংসার রাখি।

দেখ দেখ, আমাদের দেখিয়া পৃথিবীর আহ্লাদ দেখ গাছপালা মাথা নাড়িতেছে,—নদী দুলিতেছে—ধান্যক্ষেত্র মাথা নামাইয়া প্রণাম করিতেছে—চাষা চষিতেছে—ছেলে ভিজিতেছে, কেবল বেনে বউ আমসী ও আমসত্ত্ব লইয়া পলাইতেছে। মর্ পাপিষ্ঠা, দুই একখানা রেখে যা না—আমরা খাব। যে বেটির কাপড় ভিজিয়ে দে। যাক্—আমাদের বল দেখ! দেখ, পর্বতকন্দর, দেশ-প্রদেশ ধুইয়া লইয়া নূতন দেশ নির্মাণ করিব। বিশীর্ণা-সূত্র-কায়া তটিনীকে কূলপ্লাবিনী জলরাক্ষসী করিব। কোন দেশের মানুষ রাখিব, কোন দশের মানুষ মারিব, কত জাহাজ বাহিব, কত জাহাজ ডুবাইব—পৃথিবী। জলময় করিব। অথচ আমরা কি ক্ষুদ্র! আমাদের মত ক্ষুদ্র কে?—আমাদের মত বলবান্ কে?

অলৌকিক

সমীর চৌধুরী

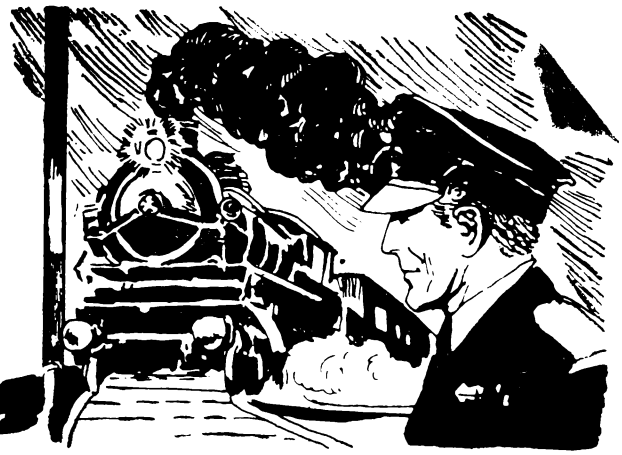

(সত্য ঘটনা অবলম্বনে)

ঘটনাটা আমার এক দূর সম্পর্কের জ্যাঠামশায়ের কাছে শোনা। সে আজ অনেককাল আগের কথা। জ্যাঠামশাই ছিলেন পুলিশের দারোগা। যে সময়ের কথা বলছি, সে সময় তিনি কলকাতার বাইরে একটা অজ পাড়াগাঁ'র কাছে পোস্টিং-এ ছিলেন। এমনিতে আমার সেই জ্যাঠামশাই—মানে শিবনাথ মুখুজ্জে, বেশ ডাকাবুকো ধরণের লোক ছিলেন। চাকরির খাতিরে তাঁকে অনেক চোর, গুণ্ডা, খুনে, বদমায়েশের সঙ্গে মিশতে হয়েছে। ভূত-টুতের ভয় তাঁর একেবারেই ছিল না। কত সময় কত হানা-বাড়িতে, জঙ্গলে বাধ্য হয়ে রাত কাটাতে হয়েছে তাঁকে। কিন্তু কখনও, কোনদিন ভয় পেয়েছেন বলে শুনিনি। সেই তাঁর মত লোকও জীবনে একবার এমন একটা ঘটনার সামনে পড়েছিলেন—যার কোন ব্যাখ্যা তিনি খুঁজে পাননি।

আগেই বলেছি, যখনকার ঘটনা তখন তিনি কলকাতা ছেড়ে অনেকদূরে এক গণ্ডগ্রামের কাছে বদলি হয়ে চলে গিয়েছিলেন। জায়গাটার নাম আজ আর আমার স্পষ্ট করে মনে নেই। গল্পের খাতিরেই জায়গাটার একটা কল্পিত নাম দেওয়া যাক—সোনাঝুরি।

সোনাঝুরি, শহরের ছোঁয়া বাঁচানো ছোট্ট সবুজ একটা গ্রাম। আশেপাশে কোন কলকারখানা তো দূরের কথা, দু'-একটা ছাড়া পাকা বাড়িও নেই। রেল স্টেশন আছে, তবে বেশ কিছুটা দূরে। রেলের লাইন পার হয়ে উত্তর দিকে মাইল খানেক গেলেই খনি অঞ্চল। সেই অঞ্চলকে ঘিরে পাকা রাস্তা, ইটের বাড়ি—বলা চলে ছোট-খাট একটা শহরই গড়ে উঠেছে। কিন্তু সোনাঝুরির সঙ্গে এসবের যেন কোন সম্পর্কই নেই। সে তার শান্ত নিরুদ্বিগ্ন জীবন নিয়েই দিন কাটাচ্ছে।

সোনাঝুরি থানার লাগোয়া পুলিশ কোয়ার্টার। জ্যাঠামশাই সস্ত্রীক সেই কোয়ার্টারেই থাকেন। সকাল বেলায় ঘুম থেকে উঠে চান-খাওয়া শেষ করে সময় মতই নিজের কাজের জায়গায় পৌঁছে যেতেন তিনি। কাজের ব্যাপারে তাঁর সময়জ্ঞান এত টনটনে ছিল যে, একদিনও লেট করতেন না।

সেদিনও ঠিক সময়মত থানায় নিজের অফিস ঘরে পৌঁছে গেছেন জ্যাঠামশাই। কাল মাইল দুয়েক দূরের একটা গ্রামে সামান্য ছোটখাট একটা গণ্ডগোল হয়ে গেছে। সেই ব্যাপারেই তিনি সেকেণ্ড অফিসারের সঙ্গে কিছু কথা বলবেন বলে ভাবছিলেন—এমন সময় তাঁর হাতের সামনে ফোনটা বেজে উঠল শব্দ করে। খুব শান্তভাবে হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা তুলে নিলেন জ্যাঠামশাই।

—'হ্যালো—'

জ্যাঠামশাই আর কিছু বলার আগেই ওপাশ থেকে একটা উত্তেজিত কণ্ঠস্বর ভেসে এল— 'হ্যালো, সোনাঝুরি পুলিশ স্টেশন?'

—'ইয়েস।'

জ্যাঠামশাই গম্ভীর স্বরে জবাব দিলেন। কিন্তু ওপাশে যে ফোন ধরে আছে তার যেন কি হয়েছে। জ্যাঠামশাই দূর থেকেও বেশ বুঝতে পারলেন লোকটা যেন উত্তেজনায় কাঁপছে থরথর করে। তাই জ্যাঠামশাই কিছু বলার আগেই লোকটার উত্তেজিত কণ্ঠস্বর ভেসে এল আবার—'স্যার, মারাত্মক বিপদ হয়ে গেছে স্যার। এইমাত্র আমার চোখের সামনে ভয়ঙ্কর একট দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। লরীর ড্রাইভারের এখনও বোধহয় প্রাণটা টিকে আছে, এখুনি যদি চলে আসেন, হয়ত—

জ্যাঠামশাই এতক্ষণ শুনছিলেন চুপ করে। কিন্তু এবার আর থাকতে পারলেন না। প্রচণ্ড বিরক্তিতে একটা হুঙ্কার ছেড়ে বললেন—'আপনি কে? কোত্থেকে ফোন করছেন? আর দুর্ঘটনাই বা কিসের?

জ্যাঠামশাইয়ের হুঙ্কারে লোকটা যেন থতমত খেয়ে গেল একটু। বলল—'আমি স্যার—মানে আমি স্যার একজন পথচারী। এইমাত্র সোনাঝুরি লেভেল ক্রশিং-এর কাছে একটা লরী যখন রক্ষী-বিহীন রেল লাইন পার হচ্ছিল, ডাউন বোম্বে মেলের সঙ্গে—স্যার, একটু যদি তাড়াতাড়ি করেন, লোকটা বোধহয়—'

জ্যাঠামশাইয়ের আর ধৈর্য ছিল না শোনার। ঝট করে হাতের ঘড়িটা একবার দেখে নিলেন। ঘড়িতে দশটা বেজে পঁয়ত্রিশ। হ্যাঁ, ঠিক সাড়ে দশটাতেই বোম্বে মেল সোনাঝুরি লেভেল ক্রশিং-এর ওপর দিয়ে যাবার কথা। বেশি দেরি হয়নি—হয়ত সত্যিই আহত ড্রাইভারটা বেঁচে যেতে পারে। সুতরাং আর দেরি না করাই ভালো। জ্যাঠামশাই অচেনা লোকটার উদ্দেশ্যে বললেন—'আপনি দাঁড়ান, আমি এখুনি আসছি।'

দেখতে দেখতে সাজ-সাজ রব পড়ে গেল থানার মধ্যে। ততক্ষণে ব্যাপারটা সবাই জেনে ফেলেছে। চাকরি ক্ষেত্রে জ্যাঠামশায়ের বরাবর সুনাম ছিল, কোন ব্যাপারকেই তিনি অবহেলা করতেন না কখনও। তা সে যত ছোট ব্যাপারই হোক না কেন, সুতরাং নিজেই তিনি তৈরি হয়ে নিলেন। সঙ্গে নিলেন সেকেণ্ড অফিসার প্রণববাবু ও চারজন কনেস্টবল, বলা যায় না যদি বেশি লোক আহত হয়ে থাকে!

থানা থেকে জীপগাড়িতে লেভেল ক্রশিং-এর দূরত্ব মিনিট দশেকের। দেখতে দেখতে পৌঁছে গেলেন ওরা। কিন্তু এ কি! নিজের চোখকেও যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না জ্যাঠামশাই। দুর্ঘটনা তো দূরে থাক—নির্জন লেভেল ক্রশিং-এর ধারে কাছে একটা কাক-পক্ষীরও সাড়া নেই। দেখে-শুনে ওরা প্রত্যেকেই একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলেন। সবচেয়ে অবাক হলেন জ্যাঠামশাই নিজে। এতদিন চাকরি করছেন—কিন্তু এমনভাবে

কেউ কখনও তাকে ধাপ্পা মারেনি। নিজের ওপরেই রাগ হচ্ছিল তার। লোকটার নাম-ধাম, কোথা থেকে ফোন করছে কিছুই জিজ্ঞেস করেন নি তিনি। লেভেল ক্রশিং-এর আশেপাশে কোথাও টেলিফোন নেই, এ তো জানা কথাই। শুধু রাগ নয়, কেমন যেন লজ্জাও হচ্ছিল তাঁর। সেকেণ্ড অফিসার প্রণববাবু আর কনেস্টবলরা না জানি কি না কি ভাবছেন তার সম্বন্ধে। কি বলবেন ওদের কিছু ভেবে না পেয়ে চুপ করেই ছিলেন জ্যাঠামশাই। তাঁকে গম্ভীর হয়ে চুপ করে থাকতে দেখে প্রণববাবু বললেন 'স্যার, ব্যাপারটা খুব গোলমেলে মনে হচ্ছে আমার।'

চমকে উঠলেন জ্যাঠামশাই। বললেন—'মানে?'

—'ঠিক বুঝতে পারছি না, কিন্তু আমার মনে হয় এসেই যখন পড়েছি, তখন জায়গাটা একবার ভালোভাবে দেখে যাই।'

—'তাই চলো।'

কথা শেষ করে সবাই মিলে জীপ থেকে নামলেন ওরা। তারপর যে যার মতো ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন জায়গাটা। এমন কিছুই নজরে পড়ল না কারুর—যা সন্দেহজনক মনে হতে পারে।

দেখতে দেখতে আরো পনেরো মিনিট সময় পার হয়ে গেল। আর দেরি করা ঠিক হবে না ভেবে জ্যাঠামশাই সবাইকে গাড়িতে উঠে পড়তে বললেন। হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন এগারোটা বাজে। গাড়ি স্টার্ট করতে যাবে ড্রাইভার, এমন সময় হাতের ইশারায় তাকে থামতে বললেন জ্যাঠামশাই। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে সবাই মিলে লেভেলক্রসিং পার হয়ে ধুলো ওড়া রাস্তাটার দিকে তাকাল। দূরে প্রচণ্ড গতিতে একটা লরীকে ছুটে আসতে দেখা গেল এদিকে। আর ঠিক তখনই—হ্যাঁ, নিজের কানকে অবিশ্বাস করার কোন কারণ নেই, হুইশিল বাজছে ট্রেনের। একটু আগেই রেলের লাইনটা বাঁক নিয়েছে বলে দেখা যাচ্ছে না ট্রেনটাকে—কিন্তু দুরন্ত গতিতে যে একটা ট্রেন ছুটে আসছে সেটা বেশ বোঝা যাচ্ছে। ওরা সকলেই হঠাৎ এমন হতভম্ব হয়ে গেছলেন যে, কারুরই কিছু করার ছিল না। একটু পরেই ট্রেনটাকে দেখা গেল। হ্যাঁ, বোম্বে মেল লেট করেছে আজ। আর ওপাশে ঐ লরীটা····

এরপর যা ঘটবার তাই ঘটেছিল। কেউ কিছু বোঝার আগেই উন্মুক্ত লেভেল ক্রসিং পেয়ে লরীটা চলে এসেছিল আর সেই মুহূর্তে ট্রেনটাও····

তবু ভাগ্য ভালো বলতে হবে ট্রেনের কোন ক্ষতিই হয়নি। লরীর একটা কোণায় ধাক্কা লাগার ফলে লরীটা ছিটকে গিয়ে উল্টে পড়ে। ড্রাইভারের সামনে অন্য কোন লোকও ছিল না আর।

জ্যাঠামশাইরা ততক্ষণে নিজেদের কর্তব্য করতে শুরু করে দিয়েছেন। সবাই মিলে ধরাধরি করে আহত ড্রাইভারকে তুলে নিয়ে কয়েক মাইল দূরের হাসপাতালের দিকে রওনা হয়ে গেলেন। আঘাত খুব গুরুতর হলেও ড্রাইভার প্রাণে বেঁচে যায়।

এরপর পুলিশের তরফ থেকে বহু চেষ্টা করা হয়েছিল সেই অজানা লোকটিকে খুঁজে বের করার—যে জ্যাঠামশাইকে ফোন করেছিল। এমনকি লরীর ড্রাইভারকেও অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। কিন্তু আজও এর কোন কিনারা হয়নি।

লোকটা চির অপরিচিতই রয়ে গেছে।

অদ্ভুতুড়ে নেমন্তন্ন

প্রণব মাইতি

অদ্ভুতুড়ে নেমন্তন্ন ঝাঁপিয়ে এলো পাড়া।
দরজা বন্ধ, আমন্ত্রিত
এবং যারা রবাহূত
সবাই মিলে বিকট জোরে জুড়লো কড়ানাড়া।
সেই শব্দে পাশের গাঁয়ের বিচ্ছু কিছু ছেলে
জল না খেয়ে খালিপেটে
বিষম 'বিষম' খেলে।
দরজা ভেঙ্গে জানলা খুলে তাকিয়ে দেখি কি
নেভা উনুন তাতে কড়াই ফুটছে গাওয়া ঘি।

অদ্ভুতুড়ে নেমন্তন্ন খিদেয় জ্বলে গা
আমন্ত্রিত রবাহূত
এসব দেখে শুনে ভীত
যারা ডেকেছিলেন—তাদের দেখা মিলছে না

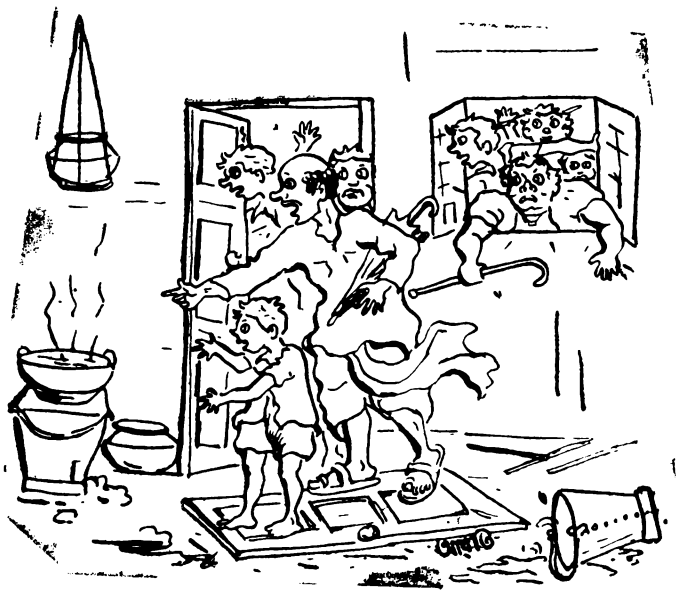

দিনদুপুরে ঘি ফুটছে—আহা—ঘি-ভাত কই!
বাইরের লোক ঘরে ঢুকে
ভাঙছে হাঁড়ি একে একে
তার ভেতরেই পাওয়া গেল কয়েক হাঁড়ি দই।

ঘিয়ের কড়াই সাফ হয়েছে
দইয়ের হাঁড়ি ফাঁক,
এবারে চল্ রান্না ঘরে
ডাক সবাইকে ডাক।

রান্না ঘরে ঘাপটি মেরে বসে আছেন তাঁরা
অদ্ভুতুড়ে নেমন্তন্নে
ডেকেছিলেন যাঁরা
দশহাত জুড়ে বেরিয়ে এলেন
ওরা পাঁচটি ভাই
'আজকেই যে নেমন্তন্ন ভুলেই গেছি তাই'
আসুন বসুন ক্ষমা করুন চাপিয়ে দিচ্ছি ভাত
মরাই বোঝাই ধান রয়েছে
লাগান সবাই হাত।

'ধান ভানিয়ে চাল চাপিয়ে
ঘিভাত খাওয়া যাবে
দিনের খাওয়া রাতেই খাবেন
খাওয়া কে আটকাবে?'

ধান ভানিয়ে চাল আনিয়ে
তারপরেই তো ভাত
পুকুর ভরা মৎস্য আছে
কে দ্যায় অপবাদ?

এসব শুনে আমন্ত্রিত এবং রবাহূত
খিদের জ্বালায়—দৌড়ে পালায়
পরাণ ভয়ে ভীত।

যারা ডেকেছিলেন তাঁরা পাঁচটি ভুলো ভাই
হোহো হেসে গড়িয়ে পড়ে—
'ব্যাপার যাচ্ছেতাই'।

Let the buds of your hopes and aspirations blossom under the surest protection of Peerless.

Estd. 1932

The Peerless General Finance & Investment Co. Ltd.

Registered Office: PEERLESS BHAVAN
3, Esplanade East, Calcutta-700 069

India's largest non-banking Savings Company

ম্যাজিক শেখা কঠিন নয়

যাদুকর বি. কুমার

বালিগঞ্জ স্টেশনের দিক থেকে আমরা তাড়াতাড়ি দশ নম্বর বাস স্ট্যাণ্ডের দিকে এগোচ্ছিলাম। সময় মত হাওড়া স্টেশনে পৌঁছতে না পারলে ট্রেন-টা পাবো না। এমন সময় কোথা থেকে কানে ভেসে এল—"জাদু, গড়বাঙ্গাল কা জাদু—কামরূপ কামাখ্যা কা জাদু"—তার সঙ্গে ডুগডুগির ডুগডুগ শব্দ। চেয়ে দেখলাম একটু দূরে ফুটপাথের উপর কিছু লোক গোল হয়ে ভিড় করে আছে। কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে গেলাম। দেখলাম এক শীর্ণকায় বৃদ্ধাকে। মুখের চামড়া কোঁচকানো—একমাথা জটপড়া চুল। এক হাতে সে ধরে আছে একটা হাত দেড়েক লম্বা দড়ির এক প্রান্ত, অন্য হাতে তার ডুগডুগি। ডুগডুগি বাজাতে বাজাতে সে চেঁচাচ্ছে "গড় বাঙ্গাল কা জাদু—কামরূপ কামাখ্যা কা জাদু—লাগ লাগ লাগ ভেলকি!" সবিস্ময়ে সবাই দেখলো তার হাতের জড়ানো দড়িটার একটা মাথা ধীরে ধীরে সোজা হয়ে উপর দিকে উঠতে লাগল, দড়ির অপর মাথাটা তার দু' আঙ্গুলে ধরা। এইভাবে দড়িটা শক্ত হয়ে সোজা হয়ে রইল উপর দিকে। কিছুক্ষণ এভাবে রাখার পর সে অন্য হাতটা দড়ির কিছুদূর থেকে নাড়াতেই দড়িটা আগের মত নরম হয়ে নেতিয়ে পড়ল মাটির উপর।

কী, ভাবছ গাঁজাখোরী গল্প? একটা দড়ি আবার সোজা হয়ে উঠবে কী করে? অসম্ভব? তা হয়তো তোমরা ভাবতে পারো। তবে বলছি শোন—এটা আসলে একটা বিখ্যাত জাদুর খেলা। নাম—ভারতীয় দড়ির খেলা (Indian rope trick)। এখন এর কৌশলটা বলছি শোন—

প্রথমে তোমাদের কেরোসিন তেলের স্টোভে যে ধরণের ফিতে লাগান হয় সেই ধরণের কুড়ি ইঞ্চি লম্বা একটা ফিতে নিয়ে সেই ফিতের ভিতর থেকে তুলোর তৈরী সুতোর মত অংশগুলো বের করে ফেলতে হবে। এরপর বাজার থেকে একটা স্টিলের মাপবার ফিতে কিনতে হবে। এই ফিতে জড়ানো থাকে একটা খাপের ভিতর। এই ফিতের ধর্ম যেদিকে স্কেলের হিসাব দেওয়া আছে সেদিকটা উপর দিকে রাখলে প্রায় দু-তিন ফুট পর্যন্ত শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আবার উল্টো দিকটা উপরে আনলে নরম হয়ে ঝুলে পড়ে মাটির উপর। এই ফিতে থেকে তোমাকে দেড় ফুট কেটে নিয়ে স্টোভের ফিতেটার ভিতরে ঢুকিয়ে ফিতের দু-মুখ সেলাই করে ফেলতে হবে। ম্যাজিক দেখাবার আগে এই দড়িটা এমন করে ধরবে যাতে মাপ লেখা দিক নিচের দিকে থাকে, এর ফলে দড়িটা নরম হয়ে সাধারণ দড়ির মতই দেখাবে। এরপর এটাকে হাতে জড়িয়ে নিয়ে মাপ লেখা দিকটা উপর দিকে রেখে ধীরে ধীরে খুলতে খুলতে শেষ মাথাটা দু আঙ্গুলে ধরে দড়িটাকে উপর দিকে সোজা করে রাখতে হবে। এই অবস্থায় দড়িটাকে একটু হেলিয়ে রাখতে হয়। যাতে মাপ লেখা দিকটা হঠাৎ ঘুরে গিয়ে খেলা শেষ হবার আগেই দড়িটা মাটির দিকে ঝুলে না পড়ে। খেলার শেষে অন্য হাতটা দড়ির কিছু দূর থেকে এমনভাবে নাড়াবে, যাতে দর্শক মনে করে তুমি অলৌকিক কিছু করছ। এই ভাবে হাতটা দুবার নাড়িয়েই দড়িটা দু আঙ্গুলে ধরা অবস্থায় একপাক ঘুরিয়ে দেবে। এতে মাপ লেখা দিক নিচে এসে দড়িটাকে নরম করে দিলেই সেটা মাটির দিকে ঝুলে পড়ে সাধারণ দড়ির মতই দেখাবে। এই খেলা দেখে দর্শক বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যখন হাততালি দিয়ে উঠবে, তখন তোমার খেলা দেখানো সার্থক হবে। ছাখো চেষ্টা করে সবাইকে অবাক করে দিতে পারো কিনা।

প্রবাদপুরুষ বিধানচন্দ্র

—মনোজকুমার সূত্রধর

বলতে পারো ১লা জুলাই তারিখটি আমাদের কাছে স্মরণীয় কেন ?

....এই দিনটিতে আমরা এমন এক বিরল পুরুষকে পেয়েছিলাম যাঁর খ্যাতি শুধু পশ্চিম বাংলায় নয়, কালক্রমে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। কে এই মহান ব্যক্তিটি জানো ? ইনি হচ্ছেন বাংলার রূপকার ডঃ বিধানচন্দ্র রায়।

হ্যাঁ, ডঃ বিধানচন্দ্র রায় জন্মগ্রহণ করেন ইংরাজী ১৮৮২ সালে ১লা জুলাই।

....এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম হয় তার। তার বাবার নাম ছিল প্রকাশচন্দ্র এবং মায়ের নাম অঘোরকামিনী দেবী।

ছেলেবেলায় অতি সাদাসিধে জীবনযাপন করতেন তিনি। দেখলে মনেই হতো না এই ছেলের কোন উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আছে। অথচ এই খর্বাকৃতি রোগা ছেলেটিই কালে নিজের সংযম, সহিষ্ণুতা ও অধ্যাবসায়ের জোরে একে একে শিক্ষার স্তর পেরিয়ে হতে পেয়েছিলেন ডঃ বিধানচন্দ্র রায়—হতে পেরেছিলেন স্বাধীনতা-উত্তর বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তথা কর্ণধার। বাংলা ও বাঙালীর উন্নতিবিধানে উৎসর্গীকৃত প্রাণ হয়ে 'বাংলার রূপকার' 'কর্মযোগী' ইত্যাদি আখ্যাও লাভ করেছিলেন তিনি।

ডাঃ রায় ছিলেন বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি। শিক্ষা, সংস্কৃতি শিল্প, রাজনীতি সব কিছুতে ছিল তার অসাধারণ প্রতিভা। আর চিকিৎসাশাস্ত্রে তো তিনি একজন বিশ্ব বিখ্যাত কিংবদন্তী পুরুষ ছিলেন। তিনি বহু কঠিন রোগ অত্যন্ত সহজ ও সরল চিকিৎসার মাধ্যমে ভাল করতে পেরেছিলেন। ডাঃ রায়ের চিকিৎসা সম্বন্ধে আজ তোমাদের একটি মজার ঘটনা বলি। একবার এক ভদ্রলোকের হাঁচির রোগ হলো, হাঁচির রোগ মানে, একটু পরপরই হাঁচতো। অথবা হাঁচতে আরম্ভ করলে অনেকক্ষণ ধরে হাঁচতেন। কি বিশ্রী ব্যাপার বলতো ? এর ফলে একদিকে যেমন তাঁর প্রচণ্ড কষ্ট হতো, অন্যদিকে তিনি যখন হাঁচতেন, তাঁর পাশের লোকজন খুবই বিরক্ত হতো। তোমরাই বলো, ধর, তোমাদের যখন স্কুলে ক্লাশ চলছে, বা তোমরা যখন সবাই গল্প করছো, কেউ যদি তোমাদের মধ্যে বারবার হাঁচে কি অবস্থা দাঁড়াবে ? তোমরাও নিশ্চয়ই বিরক্ত হবে। একদিকে লোকের অবহেলা ও আর একদিকে নিজের শারীরিক কষ্ট, তাঁর জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছিল, অনেক ডাক্তারকে দিয়ে অনেক চিকিৎসা করালেন, অনেক ওষুধ খেলেন, কিন্তু কিছুতেই আর হাঁচি কমে না। কেউ

তাঁকে বললো X-Ray করতে, কেউ বললো Blood Test করাতে, সবই করানো হলো, কিন্তু হাঁচি আর কমে না। তখন ঐ ভদ্রলোক ঠিক করলেন যে শেষবারের মতো একবার ডাঃ রায়কে দেখাবেন এবং তাতে যদি ভাল হয় তো হবে, তা না হলে এ জীবন আর রাখবেন না। যাই হোক একদিন বহু চেষ্টার পর ডাঃ রায়ের কাছে গেলেন। ডাঃ রায় সমস্ত কিছু মনযোগ দিয়ে শুনলেন এবং উনি তার সহযোগীকে একটি চর্চ আনতে বললেন। টর্চ দিয়ে নাকের ভিতর ভালভাবে পরীক্ষা করলেন, তারপর তার সহযোগীকে একটি কাঁচি আনতে বললেন। রোগী তো ভয়ে অস্থির। একদিকে হাঁচতে লাগল, আর একদিকে ভয়ে কাঁপতে লাগলো। ডাঃ রায় তখন কাঁচি নিয়ে ওটা রোগীর নাকের ভিতর ঢুকিয়ে কয়েকটা চুল কেটে দিলেন। ব্যাস, কয়েক মিনিট পরেই হাঁচি একদম বন্ধ। রোগীও অবাক, কাছে যারা ছিল তারাও সবাই অবাক। ঐ ভদ্রলোক ডাঃ রায়ের পায়ে জড়িয়ে ধরে বললেন, ডাক্তারবাবু আপনি আমার প্রাণ বাঁচালেন।

আসলে হয়েছিল কি, নাকের গোড়ার দিকে দুই একটি চুল বড় হয়ে যাওয়ায় নাকের ভেতরকার দেওয়ালে শ্বাস-প্রশ্বাস নেবার সময় স্পর্শ করতো, তার ফলে হাঁচির সৃষ্টি হতো। তোমরাও যদি নাকের ভিতর কাঠি বা অন্য কিছু দিয়ে খোঁচাও, তাহলে হাঁচবে না? কিন্তু মজার ব্যাপার কোন ডাক্তারই এটা কল্পনা করতে পারে নি এবং ভুল চিকিৎসা ও অত্যাধিক ঔষধ খাওয়ার ফলে রোগী শেষ অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিলেন। সত্যি কি ভীষণ ব্যাপার বলতো? যদি শেষ পর্যন্ত ঐ ভদ্রলোক ডাঃ রায়ের কাছে না আসতেন তাহলে হয়তো তার জীবনই নষ্ট হয়ে যেত। এইভাবে ডাঃ রায় অত্যন্ত সহজ ও সরল পদ্ধতিতে চিকিৎসা করতেন। এই জন্যই তো এই বিরাট কীর্তিমান মানুষটিকে সবাই শ্রদ্ধা জানায়।

জেনে নাও

—সর্বজ্ঞ

পাখীও কুকুরের মতো ঘেউ ঘেউ করে

কুকুর মাত্রই ঘেউ ঘেউ করে ডাকে। শুধু তাই নয় পাখীও ডাকে ঘেউ ঘেউ করে। এই পাখীদের নাম 'গুইডগাইড' (Guidguid)। দক্ষিণ আমেরিকাতে এদের দেখা মেলে।

খ্রীষ্টাব্দ নিয়ে গণ্ডগোল

খ্রীষ্টাব্দ বলতে আমরা বুঝি যীশুর জন্ম সাল থেকে যার গণনা শুরু হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে তা হয় নি। যীশুর জন্মের চারবছর পর থেকে এর গণনা শুরু হয়েছে। তাই ঠিকমতো যদি গণনা করা হতো তবে আরও চার বছর বেড়ে যেতো।

উল্কাপাতের রকমফের

উল্কা নিশ্চয় সবারই দেখা। আকাশ থেকে তারা খসে পড়ার যে ঘটনা ঘটে তা আসলে ঐ উল্কা। বছরের সব দিন কিন্তু সমানভাবে উল্কা পড়ে না। সাধারণতঃ ২১শে এপ্রিল থেকে ১৪ই আগষ্ট এবং ২৭শে ও ২৯শে নভেম্বর ঝাঁকে ঝাঁকে উল্কা বর্ষণের ঘটনা ঘটে।

স্বাদে ঝাল যে ফুল

ফুলের স্বাদও ঝাল হয়। আর এর নাম লবঙ্গ। ভারত ও পার্শ্ববর্তী কয়েকটি দেশে এক ধরণের ফুলকে শুকনো করে তৈরী হয় লবঙ্গ। সুস্বাদে রান্নার ক্ষেত্রে যা প্রায় অপরিহার্য।

পাখীখেকো গাছ

গাছ আবার পাখী খায় নাকি! এর হাত পা-ই বা কোথায় যে পাখী ধরে খাবে? শুনতে অবাক লাগলেও নিউজিল্যাণ্ডে একরকমের গাছ আছে যারা পাখী ধরে খায়। এই গাছের নাম 'পাইসোনিয়া ব্রুনোয়িনা।' এই গাছের গা থেকে একরকমের আঠা বের হয়, যাতে বড় বড় পাখী আটক করা যায়। আঠায় কোন পাখী আটক হলেই গাছটা তার নিজের রসে পাখীটাকে জারণ করে শোষণ করে।

পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম বই

পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম বইটি আছে পোল্যাণ্ডে। বইটি লম্বায় $\frac{3}{8}$ ইঞ্চি, আর চওড়ায় মাত্র ৩$\frac{1}{2}$ ইঞ্চি। তবে এতে পাতার সংখ্যা ১২০। বর্তমানে এটি রাজধানী ওয়ারশ শহরের গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে।

বেলাভূমি বকখালি

—পার্থ ঘোষ

'পথের পাঁচালী'র অপুর ছিল বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা। সমস্ত অজানাকে জানা, অচেনাকে চিনতে সদা প্রস্তুত ছিল তার মন। আবার 'ডাকঘরে'র অমল ছিল সুদূরের পিয়াসী। তার চার দেওয়ালের মাঝে বন্দী অসুস্থ শরীর বারবার ছুটে যেতে চাইত উদার প্রকৃতিতে। অবশ্য আজকাল পড়াশোনার চাপে অনেকেই এই চিনবার-জানবার সুযোগ পায় না। তারা জানতেই পারে না পরিচিত গণ্ডীর বাইরে একটা সুন্দর জগৎ আছে। সেই জগৎ প্রকৃতির সম্ভারে সজ্জিত। বিশাল সুনীল আকাশ, দিগন্ত বিস্তৃত সমুদ্র, আর সবুজের সমারোহে ভরা তার রূপ। যারা বেড়াতে যায়, তারা অনুভব করে বেড়ানোতেই কী স্বর্গসুখ।

এমন এক সুযোগ এসেছিল কিছুদিন আগে। আমার দুই বিচ্ছু ছাত্র পিকু আর সুকু'কে নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হয়েছিল। গরমের ছুটি সবে মাত্র পড়েছে। তার ওপর ওদের মা-বাবা প্রথমেই অনুমতি দিয়ে ফেললেন। তাই ছাত্রদের আব্দারকে প্রত্যাখ্যান করতে পারলাম না। বসে গেলাম বেড়াতে যাওয়ার জায়গা নির্বাচনে। প্রথমেই 'পুরী ঘিঞ্জি' বলে উঠেছিল পিকু। আর সুকু'র বন্ধু গোপালপুর গিয়েছিল। ফলে দুটো জায়গাই বাতিল হয়ে গেল। এইসময় ওদের বাবা এসে প্রস্তাব দিলেন কলকাতা থেকে ১৩২ কি.মি. দূরবর্তী বকখালি যাও। ব্যাস আমাদের তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল।

ধর্মতলা থেকে যখন বাস ছাড়লো ঘড়িতে তখন সকাল আট'টা। যথারীতি হাত নেড়ে বিদায় জানানো হলো। তারপর গাড়ি গতি নিল। একে একে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, রেস কোর্স, চিড়িয়াখানা ছাড়িয়ে কলকাতাকে পিছনে ফেলে আমাদের গাড়ি ছুটে চললো দক্ষিণে। একসময় আমরা পৌঁছালাম কাকদ্বীপ—তারপর ডায়মণ্ড হারবারে। বাসের জানালা দিয়ে নদী দেখে চেঁচিয়ে উঠল পিকু সুকু। তাদের কী আনন্দ!

বাস আবার ছুটে চললো। এবার এসে থামলো নামখানায়। আমাদের নামতে হলো। বাস আর যাবে না। সামনে নদী। নাম শুনলাম ছেতানিয়া-দোয়ানিয়া। খুব একটা চওড়া নয়। তবু ঐ নদী পেরোবার ব্রীজ না থাকায় এপারের বাস ওপারে যেতে পারে না। নদী পার হয়ে ওপারে আরো ঘণ্টা দেড়েকের পথ পার হলে তবেই সমুদ্র।

যাই হোক সামনের সারিবদ্ধ দোকানগুলির একটাতে ঢুকে সিঙ্গাড়া-মিষ্টি খেলাম। নতুন দেখার আনন্দেই

বোধহয় তাড়াতাড়ি খাওয়া হয়ে গেছিল। এবার নদী পার। ছোট্ট নদী দেখে সুকু-পিকুর আনন্দ আর ধরে না।

নদী পার হয়ে তিন পয়সার টিকিট কাটতে দেখে ওরা তো হতবাক। পরে বুঝিয়ে বললাম, সরকারি নৌকা বলে এতো কম পয়সার ভাড়া দিতে হয়। এপারে দুটো বেসরকারি বাসকে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। পিকু সুকুকে নিয়ে উঠে পড়লাম; বাস ছাড়লো কিছুক্ষণ পরে। তারপর আমরা ফ্রেজারগঞ্জ হয়ে এসে পৌছালাম বকখালি। আগে থেকেই ঠিক করা ছিল সরকারি টুরিষ্ট লজে থাকব। বেশ কিছু হোটেলের এজেন্ট এড়িয়ে এগিয়ে গেলাম সোজাসুজি। তারপর দেখলাম মাটি থেকে কিছুটা উঁচুতে কাঠের একতলা বাড়ি। বেশ অনেকটা জায়গা জুড়ে সাজানো গোছানো বাড়িটা দেখলেই ভালবাসা জন্মে যায়। পিকু-সুকু দু'ভাই গ্রীলের দরজা ঠেলে দৌড়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল।

যথারীতি কাগজপত্র দেখিয়ে ঘর পেলাম। সমুদ্রের দিকে যাওয়ার রাস্তার ধারেই। ঘরে ঢুকেই দু'ভাই বায়না ধরল সমুদ্র-স্নান করবে। অগত্যা খাবার তৈরি করতে বলে এগোলাম সমুদ্রের দিকে। দূর থেকে সমুদ্রের তর্জন গর্জন শুনছিলাম। পরে যতো এগোলাম তত শব্দ বাড়ল। তারপর বালির ঢিবি পার হয়ে একটু এগোতেই সামনে দেখি ধূ-ধূ রূপালী বেলাভূমি। আর সমুদ্র-ঢেউ তার ওপর আছড়ে পড়ছে। আবার ফিরে চলে যাচ্ছে দূরে। হঠাৎ পিছনে ফিরে দেখি আশ্চর্য দৃশ্য। সারবন্দী ঝাউগাছ সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছে।

পিকু-সুকু তো আনন্দে উত্তেজনায় প্রথমেই বালির চর ধরে কিছুটা দৌড়াদৌড়ি করে নিল। তারপর ক্লান্ত-শ্রান্ত শরীর নিয়ে সমুদ্র-ঢেউয়ের সঙ্গে খেলায় মাতল। ঢেউ কখনও শান্ত থাকতে দেয় না। মাঝে মাঝেই উল্টে-পাল্টে ফেলে। আর নোনা জল ঢুকে পড়ে নাকে মুখে। সে কী অবস্থা। একদিকে আনন্দ, আর অন্যদিকে নোনা জলে চোখ জ্বালার অনুভূতি।

দুপুরের খাওয়া খেয়ে কিছুটা বিশ্রাম নিলাম। তারপর রোদের তেজ কমে আসতে বেরিয়ে পড়লাম গ্রাম দেখতে। সন্ধ্যায় আকাশে রূপার থালার মতো চাঁদ উঠল। পিকু আব্দার ধরল, জ্যোৎস্নার আলোয় সমুদ্র পাড়ে বেড়াব। প্রথমে কিছুটা আপত্তি করলেও শেষে আমার মনেও একটা লোভ জেগে উঠল। তাই ওদের কথায় রাজি হয়ে গেলাম।

চাঁদের আলো সাদা বালির ওপর পড়ে ঝকঝক করছিল। তার ওপর দিয়ে আমরা তিনমূর্তি এগিয়ে চললাম সমুদ্রের দিকে। নিস্তব্ধ পরিবেশের মাঝে সমুদ্র-গর্জনই প্রাণের স্পন্দন তুলছিল। বালির ঢিবি পার হয়ে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। সে কী অপূর্ব দৃশ্য।

গোটা গায়ে জ্যোৎস্না মেখে বকখালি বেলাভূমিকে শুয়ে থাকতে দেখলাম। কেমন যেন ভাল লাগা অনুভূতিতে অবশ হয়ে পড়লাম। জলের ধারে বসে পড়লাম। একের পর এক ঢেউ এসে বাড়িয়ে দেওয়া পা ধুইয়ে যাচ্ছিল। আর দূরে ঢেউয়ের মাথাগুলি চাঁদের আলোয় ঝকঝক করতে দেখলাম। হঠাৎ ঘোর ভাঙতে দেখলাম জেলেরা নৌকা নামাচ্ছে জলে। পিকু-সুকু'কেও যেন কোন সম্মোহন বেঁধে রেখেছিল। ওরাও চুপচাপ হয়ে পড়েছিল।

পরদিন ঘুম ভাঙল সকালে। ফেরার তাড়া পড়ে গেছল। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম দু'ভাই নেই। কিছুক্ষণ পর দেখি দুজনেই ছুটতে ছুটতে সমুদ্রের দিক থেকে আসছে। রেগে গেছলাম। ভাবলাম বকব। তখনই পিকু বলে উঠল, 'মাষ্টারমশাই সমুদ্রকে বলে এলাম—'আবার আসব'। কথাটা যেন আমার মনেও অনুরণন তুলল। ফেরবার পথে বাসে বসে তাই মনে মনে বলে ফেললাম, 'অপরূপা বকখালি, আমি আবার আসব তোমার কাছে।

———

এখন তারা নেই

প্রদীপকুমার মিত্র

শেয়াল বলে, 'শুনছো প্যাঁচা
উত্তর ভাই দেবে,
মানুষ কেন মানুষ মারে ?
পাচ্ছি না ছাই ভেবে !

তুমিই বলো, জাত ভাইকে
আমরা কি কেউ মারি ?
অমন কাজ কেউ কখনো
করতে বলো পারি ?'

বল্‌লে প্যাঁচা, 'বোকার মত
ভাবছো শুধু এই,
মানুষ ছিল অনেক আগে
এখন তারা নেই !'

ঘোড়ার ডিম

নিশিকান্ত মজুমদার

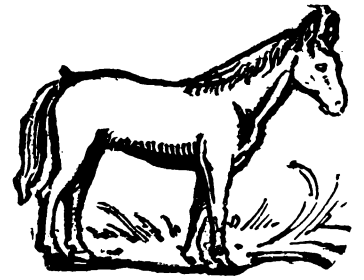

নিম শিম ঘোড়ার-ডিম
ঘোড়া হয়েছে খোঁড়া
ঘোড়ার মা চিঁহিঁ ডাকে,—
খাক্‌গে বেগুন পোড়া।
বেগুন গাছে বেগুন নেই
শিম গাছে নেই শিম
শিম বেগুন না থাকেতো
খাক্‌গে ঘোড়া নিম।
নিম খেলে ডিম পাড়বে
ডিমে ভাজবো বড়া
সেই বড়ায় দু'গাল ভরে
বলবো অনেক ছড়া।

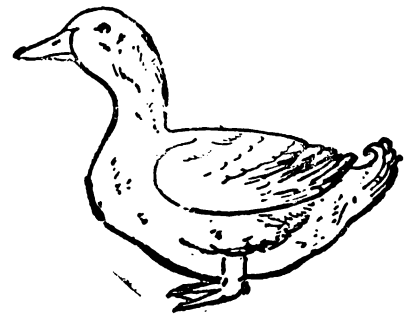

॥ একগুচ্ছ ছড়া ॥

নির্মলকুমার বিশ্বাস

এক

মিষ্টি মেয়ে আদুরে
খেলছে বসে মাদুরে
হঠাৎ দূরে দেখে চেয়ে
দাঁড়িয়ে আছে মা দূরে।

দুই

দুষ্টু ছেলে বাঁদুরে
জ্বালাচ্ছে খুব দাদুরে
রেগে গিয়ে বলে দাদু
যা দূর হয়ে যা-দূরে।

তিন

ভূতের জ্বালায় দেশ ছেড়েছি
সঙ্গে নিয়ে বেডিং
কোথা থেকে জুটলো এসে
এ কোন 'লোড-শেডিং'।

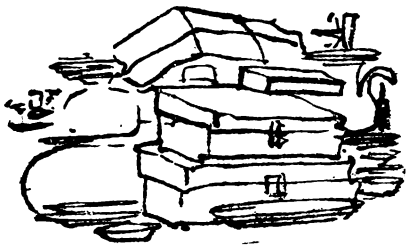

খোকাখুকু চলে আয়

বিশ্বনাথ মৈত্র

খোকাখুকু চলে আয়
হাতেখড়ি দিয়ে যা।
একবুক ভালবাসা
তোরা সব নিয়ে যা॥
ঝুড়িভরা গল্পের
পরীদের পাখনা।
একটানে খুলে দেয়
ব্যথাটার ঢাকনা॥
পাকাচুলো ভাইনীর
সাত হাত দাঁতটা।
দূর করে ঘুমটাকে
কাটাবেই রাতটা॥
সাতভাই চম্পার
বোনটির জন্যে।
ভালবাসা পাঠাবেই
যত রাজকন্যে॥
দৈত্যের হাড় দিয়ে
নৌকাটা গড়বো।
ধবধবে সাদা মনে
সব্বাই চড়বো॥

লাল চিরুনি

সম্রাট বসু (বয়স ১১)

জানোতো অনেক সময় ঠাকুররা আমাদের দেখা দেন। যেমন এসেছিলেন রামকৃষ্ণ, পঞ্চপাণ্ডব প্রভৃতিরা। তেমনি একটি ছেলের রূপ নিয়ে এসেছিলেন ঠাকুর বা ভগবান। ছেলেটি জন্মেছিল চীন দেশে। তার বাবা ছিলেন জাহাজের ক্যাপ্টেন। তিনি একটু শান্ত ছিলেন। মা ছিলেন অনেকটা উকিলের মত, তিনি লোককে ছাড়িয়েছেন কোর্ট থেকে। যখনকার কথা বলছি তখন কিন্তু অত গাড়িঘোড়া ছিল না, বাবাকে একদিন মা বললেন আমি পৃথিবী ঘুরব, বাবা তখন বললেন চল। বাবা অনেক নাবিক নিলেন। কিন্তু কয়েকজন নাবিক জাহাজ দখল করার চক্রান্ত করল। তখন কিন্তু পালতোলা জাহাজ ছিল। ঝড় উঠলে রক্ষা পেত না কেউ। বাবা এই ভয়েই ছিলেন। এখন হয়েছে কি, বাবা-মা তো যাচ্ছেন, এমন সময় একটি তাঁদের বাচ্চা হল। আর তার কয়েকদিন পরেই নাবিকরা বলে বসল বাচ্চাকে জলে ফেলতে হবে। তখন তো যারা চক্রান্ত করেছিল সেই নাবিকদের সঙ্গে অন্য নাবিকদের যুদ্ধ লাগল। কিন্তু যারা চক্রান্ত করেছিল তারাই জিতল। তখন তারা আবার বলল বাচ্চাকে ফেলে দিতে হবে। তখন বাচ্চাটার বাবা-মা একটা ভেলায় করে বাচ্চাকে ভাসিয়ে দিলেন। বাচ্চা ভেসে চলল। এখন হয়েছে কি, এই বাচ্চাটা ছিল শিব। আর একটা মজার ঘটনা দেখা দিল। যেই জাহাজটা দূরে চলে গেল তখন শিব নিজের বেশ ধারণ করলেন। শিব দেখলেন তার বাবা-মাকে দস্যুরা জলে ফেলে দিচ্ছে, আর হাঙরগুলো বাবা-মাকে খেয়ে নিচ্ছে। এখন হয়েছে কি, শিবের কাছে অনেক জিনিস থাকে তো। তা শিবের কাছে একটা যাদুদণ্ড ছিল। শিব সেটা ঘোরাতেই একেবারে ডাঙায় চলে গেলেন। তারপর শিব পৃথিবী ঘুরতে লাগলেন আর তিনি ঘুরতে ঘুরতে পিকিং শহরে এসে পৌঁছলেন। তিনি ঘুরছেন এমন সময় একটা বাড়ি দেখতে পেলেন। তখন তাঁর খুব খিদে পেয়েছিল। তাপ্পর তিনি শিবের বেশ ছেড়ে একটি কিশোরের বেশ ধরলেন। বাড়িতে তখন একটি বৌ কাজ করছিলো। তখন শিব গিয়ে বললেন.—আমাকে একটু জল দাও। বৌটি ভাবল এক ভিখারী এসেছে। সে ভিখারীকে খুব ঘৃণা করত। সে বলল, যা ভাগ। কিন্তু ঠাকুরের রাগ বাঁশ পাতার আগুন। শিব দেখলেন তাদেরই বাড়ির একটা পুকুর আছে। শিব করলেন কি পুকুরের সব জল খেয়ে নিলেন। বৌটি চেঁচিয়ে বলল 'সব্বোনাশ'। তখন শিব বললেন তুমি আমাকে জল দিলে না কেন? এইভাবে ঝগড়া লাগল। তখন বুড়ি শাশুড়ী এসে ঝগড়া থামালো। এই বুড়ি শিবের

ভক্ত ছিল। তখন বুড়ি শিবকে জল-খাবার সব দিল। আর শিব পুকুরের জল বমি করে পুকুরে দিয়ে দিলেন। আর খেয়েদেয়ে শিব বললেন বুড়ি তুমি কি চাও বল। তখন বুড়ি বলল আমি আর কি চাই বাছা? তখন শিব একটা লাল চিরুনি দিলেন এবং শিব বললেন, এই চিরুনি তুমি আরও বুড়ি হয়ে গেলে একবার আঁচড়ে নেবে তখন তোমার বয়স কমে যাবে, কিন্তু তুমি ছাড়া কেউ যেন চিরুনিতে হাত না দেয়। তাহলে মারা পড়বে। তখন পাশের বৌটির খুব হিংসা হল। সে চিরুনিটা কেড়ে নিতে চাইল। শিব সঙ্গে সঙ্গে তাকে যাদুমন্ত্র বলে একটা সাপ করে নিয়ে মাথায় ঝুলিয়ে নিলেন এবং স্বর্গে চলে গেলেন। বুড়ি হাজার বছর বেঁচে ছিল। তারপর তার স্বর্গে যাবার ইচ্ছে হল, তখন সে আর চিরুনি বোলালো না, ফলে মারা গেল। তারপর সে স্বর্গে গেল। স্বর্গে সে এখন অমৃত খায়।

●

হাসাহাসি

গৃহকর্তা ভীষণ রেগে গিয়ে বল্লেন—মুখে এক লাথি মারবো।

ভৃত্য উত্তর দিলো—আমারও দুটো পা আছে।

গৃহকর্তা বললেন—কী এতবড় তোর স্পর্ধা, আমাকে লাথি মারবি?

ভৃত্য বললো—কখন বললাম এ কথা?

এইত বললি তোরও পা আছে। তার মানে কী?

তার মানে আপনি মারতে এলে ছুটে পালিয়ে যাবো।

● ● ●

বাড়ীর কর্তা তার ঘরের মধ্যে একদিন একজন চোরকে ধরে থানায় নিয়ে যাচ্ছিলেন, যেতে যেতে হঠাৎ চোরটি বললে—বাবু একটা কথা ছিল।

কিসের কথা।

বড্ড শীত, আপনার বাড়ীর রকে আমার ছেঁড়া চাদরটা ফেলে এসেছি। নিয়ে আসবো?

কর্তা বললেন—যা, কিন্তু তাড়াতাড়ি আসবি।

রাত শেষ হ'য়ে ভোর হ'য়ে গেল চোর আর এলোনা।

সেই চোরটাকে আবার বর্ষাকালে ঐ বাড়ীর কর্তা ধরে ফেললেন। থানায় নিয়ে যাবার সময় মাঝ পথে দাঁড়িয়ে পড়ে চোরটা বললে—বাবু একটা কথা বলব?

কিসের কথা?

ছেঁড়া ছাতা একটা আপনার ঘরের বাইরে ফেইলে এসেছি। ছুটে গিয়ে নিয়ে আসবো?

বাবু বললেন—মাথা খারাপ আমার, সেবারে তুমি বেটা চাদর আনতে গিয়ে আর ফিরে আসনি। আবার তোমাকে যেতে দেবো? এবারে তুমি বরং দাঁড়াও আমি গিয়ে নিয়ে আসছি।

● ● ●

ইংরাজীর শিক্ষক পানুকে ডেকে বললেন—এই বলত "Rome was not built in a day" মানে কি?

খুব সহজেই পানু উত্তর দিল—স্যার, রোম শহর রাত্রির বেলায় তৈরী হয়েছে। দিনের বেলায় মিস্ত্রিরা কাজ করেনি।

শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মিত্র—যাঁর অনুপ্রেরণায় ও উৎসাহে এই পত্রিকা প্রকাশিত হোল। অন্যান্য যাঁরা উৎসাহ দিয়েছেন তাঁরা হলেন—সর্বশ্রী বরুণ সেন, মনোজ সূত্রধর, বিমলকান্তি সাহা, প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, মিঃ গোপ (ভেরোনা কমার্শিয়াল ক্রেডিট এ্যাণ্ড ইনভেস্টমেণ্ট কোঃ) ও আরও অনেকে। বিভিন্ন ভাবে সাহায্য পেয়েছি যাঁদের কাছে তাঁরা হলেন—সর্বশ্রী অমর রায়, কমল পাল্লোধী, তরুণ দাস, হারু ঘোষ, শক্তি ঘোষ, তপন চৌধুরী ও খগেন মিত্র।

পাখিটা

বিভাস রায়চৌধুরী (বয়স ১৬)

পাখিটার নাম ঠিক ব'লতে পারছি না। তবে ওকে আমি ভীষণ চিনি। শরতের সোনা রোদ্দুরের মতো ওর গায়ের রং। যখন আনন্দে শিস্ দেয় তখন কোনো মিষ্টি-গলার মেয়ের গান ব'লে মনে হ'তে পারে। ছোট্ট দুটো ডানা মেলে যখন ও নিজেকে খোলা বাতাসে ছেড়ে দেয়, তখন ওকে দূর থেকে রূপকথার দেশের পাখি ব'লে মনে হয়। এই ছোট্ট, মিষ্টি, সুন্দর চেহারার পাখিটা প্রায়ই আমার বাগানে এসে ব'সতো। আমি হয়তো তখন প'ড়তাম। হঠাৎ ওর শিস্ শুনে চোখ ফেরাতাম বাগানের দিকে। ও একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতো আমার দিকে। আমি কেমন যেন নির্বাক, নিশ্চল হ'য়ে যেতাম। মানে জ্যাঠামশাই যাকে বলে অভিভূত হ'য়ে যাওয়া। যা হোক আমি হয়তো এক সময় হাত নাড়াতাম মন্ত্র মুগ্ধের মতো। ও লাফ দিয়ে আমার টেবিলে এসে ব'সতো। আমি ওর ছোট্ট

মোলায়েম গায়ে হাত বুলিয়ে আদর ক'রতাম। পাখিটা তখন আনন্দে শিস্ দিতো। আমি আহ্লাদে পাখি হ'য়ে যেতাম। পড়া ভুলে মেতে উঠতাম ওর সাথে খেলায়। আমি ওকে মাঝে মাঝে ব'লতাম, "পাখি, তুমি কতো ভাল।" ও চুপ ক'রে থাকতো, আর ছোট্ট ঘাড়টা নাড়াতো। মানে ওর ভালো লাগতো। আমারো ভালো লাগতো। আমি একসময় ভাবতে শুরু ক'রে দিয়েছিলাম ও দুব্বোঘাসের মতোই একদম সহজ, সরল।

অথচ এই পাখিটাই কয়েকদিন হ'লো একদম অন্য চেহারার হ'য়ে গেলো। কী ক'রে হ'লো? সেটাই বলা যাক্। সকালে উঠে সেদিন পাখিটা দেখলো লালচে মেঘের দল পূব আকাশে অসংখ্য বদ্বীপ তৈরী ক'রেছে। ওর মনে শয়তান ভর ক'রলো। ওর ভারি ইচ্ছে হ'লো রাজা হওয়ার। প্রথমেই ও ঠিক ক'রলো ওই ডানকোণের সুন্দর বদ্বীপটিতে পৌঁছে নিজের পায়ের ছাপ এঁকে দিয়ে নিজেকে সম্রাট ব'লে ঘোষণা ক'রবে। অবিশ্যি বুদ্ধিটা ওর না। ওর মনের ভেতরের শয়তানটার। ও উড়তে শুরু ক'রলো।

দ্রুতবেগে বাতাস কেটে এগোতে এগোতে একসময় বদ্বীপে পৌঁছলো। আশ্চর্য মেঘের ব-দ্বীপে পা দিতে গিয়ে ও দেখলো সব ফাঁকা। ব-দ্বীপটার রংও লাল না। কারখানার কালো ধোঁয়ায় সেটা তৈরী। ও নিজের ভুল বুঝতে পারলো। লোভের অদ্ভুত এই শাস্তির কথা ভাবতে ভাবতে পাখিটার মাথা লজ্জায় নুয়ে এলো। ও আবার নীচের পৃথিবীর দিকে রওনা হ'লো। ততোক্ষণে ওর শরীরটা কালো ধোঁয়া মেখে কালো হ'য়ে গেছে। সুরেলা কণ্ঠ পরিণত হ'য়েছে বিকৃত গলায়।

আর সেই লজ্জাতেই ও আর দিনের আলোয় বাইরে বেরোয় না। আমার বাগানেও আর আসে না। অন্ধকারের কালোতেই এখন ওর বাসা। আচ্ছা, পাখিটা কি আর কোনো দিনই আগের রূপ কিংবা গলা ফিরে পাবে না? কে জানে তোমরা কিন্তু কোনদিন অমন লোভী হোয়ো না।

শরীর ও স্বাস্থ্য

ডাঃ ডি. আদিত্য

তোমাদের সব হাতে খড়ি হয়ে গেলো তো? এবার শরীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধেও কিছু হাতেখড়ি হোক।

এখন খাতা, কলম, শ্লেট, পেন্সিল নূতন সব কত রং চংয়ে হরেকরকমের বই। বা! কি মজা!

আচ্ছা, পড়তে যেমন হবে, পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের দেহটাকে খুব মজবুত করে গড়ে নিতে হবে। শরীর শক্ত

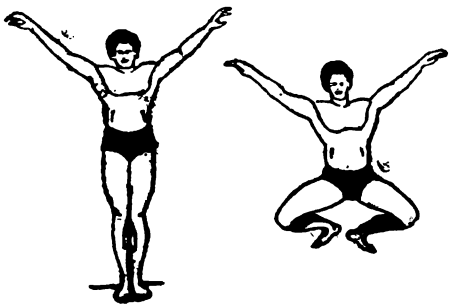

হলে মনটাও খুব তেজী হবে—আর মনটা তেজী হলে সবরকম কাজ নিখুঁতভাবে করতে পারবে।

তোমাদের বয়স এখন কত হবে? ধর ৫ কি ৬ বছর হয়েছে। তোমাদের এই বয়সে একটা ডাবল এ্যান্টিজেন ইনজেকসন নিতে হয় (Double Antigen Booster-dose) এবং Oral Polio Vaccine নেওয়া হয়েছে কিনা বাবা-মাকে জিজ্ঞেস করে নেবে, না নেওয়া হলে নিয়ে নেবে।

এখন খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে পড়ছো। না বর্ষায় আরও একটু শুয়ে আরাম করছো।

একটু সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে পড়াই ভালো। ঘুম থেকে উঠে দাঁত মাজন দিয়ে পরিস্কার করো—টুথব্রাশ দিয়ে দাঁত মাজবে না। ভালো টুথপাউডার ব্যবহার করো এবং আঙ্গুল দিয়ে দাঁত মাজো—মুখ ভালো করে বেশ কয়েকবার পরিস্কার জল দিয়ে ধুয়ে ফেলো এবং চোখে বেশ কয়েকবার জলের ঝাপ্টা দাও এবং চোখ পরিস্কার করো। সকালে উঠেই পায়খানা করার অভ্যাস করবে অনেকের পায়খানা সকালে হয় না সময়মত পায়খানা না করে। এতে হজমের গোলমাল হবার ভয় থাকে—সকালে পায়খানা পরিস্কার হলে খিদে ভালো হয় আর শরীরটাও খুব ভালো থাকে। পায়খানা এবং প্রসাব চেপে রাখবে না। যখনই প্রসাব এবং পায়খানা পাবে সেরে ফেলবে। এবার হাত মুখ ভালো করে মুছে খেয়ে নাও। সকালে কি খাবার খাবে ভাবছো কেন? টাকা পয়সা বেশী থাক আর না থাক কিছু যায় আসে না।

মুড়ী, ৫/৬টা দানা ছোলা, ভিজে একটু আখের গুড়; ভালো গুড় না পাওয়া গেলে খেজুর ৩/৪ টা গরম জলে পরিস্কার করে তারপর মুড়ি দিয়ে কিংবা এমনি খেয়ে নেবে।

বাড়ীতে নারকেল থাকলে নারকেল মুড়িও খেতে পারো। যতটা পারো ভালো করে চিবিয়ে খাবে এতে হজমও ভালো হবে আর দাঁতের মাড়িও শক্ত হবে। যারা পারবে এর সঙ্গে একটা বা আধখানা ডিমও খেতে পারো। এবার তোমাদের স্কুল যাবার পালা। ক্লাসের পড়া সেরে বাড়ীতে ফিরে এসো আবার কথা হবে।

(ক্রমশঃ)

'জিতবো বলেই তো যাচ্ছি' —পি-কে

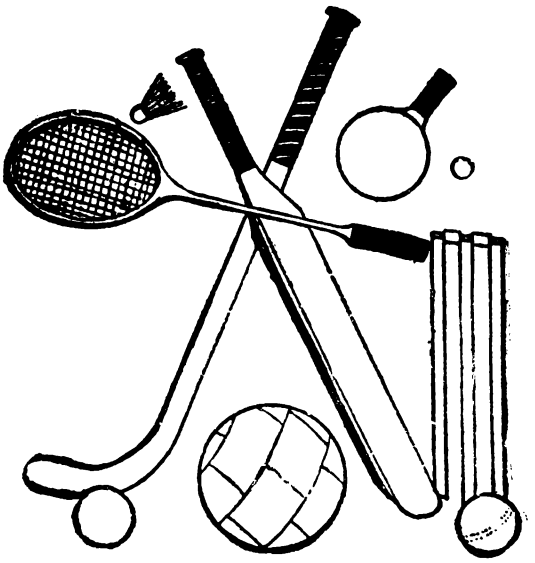

ভারতবর্ষের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত 'কোচ' হিসেবে সবার মুখে মুখে শুধু একটিই নাম, পি-কে ব্যানার্জী। দীর্ঘ আড়াই বছর পর আবার তিনি ভারতীয় ফুটবলের জাতীয় কোচ হিসেবে মনোনীত হয়েছেন। শুধু তাই নয় এবার 'কলম্বোতে' এশীয় ক্লাব চ্যাম্পিয়নশীপে 'ইষ্টবেঙ্গল দল তারই প্রশিক্ষণে খেলতে যাবে। অতএব তাঁর ব্যস্ততার শেষ নেই তবুও এই ব্যস্ততার মধ্যে তিনি আমাদের 'হাতে খড়িকে' দিয়েছেন এক সাক্ষাৎকার। যা এখানে যথাযথ-ভাবে তুলে ধরা হলো।

প্রশ্ন—আবার ভারতীর দলের জাতীর কোচ নির্বাচিত হয়ে এ মুহূর্তে আপনার মূল ভাবনা কি ?

পি-কে—ভাবনার কোন হেরফের হয়নি। আগেও যে ভাবনা ছিল, এখনো তাই আছে। তাছাড়া জাতীয় কোচ তো এবার প্রথম হলাম না। তবে হ্যাঁ, একটা ভাবনা সব-সময়ই মাথায় ঘুরপাক খায়, তাহলো কি করে ভারতীয় ফুটবলকে এশীয় মানের যে দলগুলি, তাদের সম-পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যায় এবং সেইজন্য সব-সময়ই চেষ্টা করে চলেছি।

প্রশ্ন—প্রত্যেক বছর যেভাবে খেলোয়াড় নির্বাচন হয়। এবার কি সেভাবে হবে—নাকি যারা খেলেছে তাদের থেকে বাছা হবে ?

পি-কে—হ্যাঁ এবারও প্রত্যেক রাজ্যে থেকে Performance এর ভিত্তিতে খেলোয়াড় বাছা হবে। তাছাড়া আমার আগের জাতীয় কোচদের তালিকা থেকে কিছু খেলোয়াড় নেওয়া হবে। এছাড়া Sub-Junior থেকেও নেওয়া হবে।

প্রশ্ন—এ যাবৎ ভারত যেখানেই খেলেছে, দেখা গেছে গোলের সামনে গিয়ে স্ট্রাইকারের গতি থেমে গেছে এবং ভুল শটে বল গোলের বাইরে বেরিয়ে গেছে। এ ত্রুটি আমাদের দীর্ঘদিনের। এটা কেন হয় এবং ত্রুটি শোধরাবার কোন রাস্তা ভেবেছেন কি ?

পি-কে—ত্রুটি তো আমাদের জন্ম থেকেই। আমাদের দেশে খেলোয়াড় তৈরী হয় অনেক অভাব অনটনের মধ্যে দিয়ে। তাছাড়া আমাদের দেশে খেলার পরিবেশ, বিজ্ঞানসম্মত প্রশিক্ষণ, অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদির কোন ব্যবস্থা নেই। তাই ত্রুটি থেকেই যায়। শোধরাবার হলে এইগুলির ব্যবস্থা আগে দরকার। তাছাড়া গোলের মুখে পাঁচটা বল এগিয়ে দিলে তবেই তো দুটো বল গোলে যাবে।

প্রশ্ন—মনোরঞ্জনকে এবার ভারতীয় দলে দেখতে পাবো ?

পি-কে—আশা তো করা যায়। তবে এ-আই-এফ-এ ও মনোরঞ্জনের মধ্যে যে মনোমালিন্য তা যদি মিটে যায় তবেই। অবশ্য এজন্য দুপক্ষকেই এগিয়ে আসতে হবে।

প্রশ্ন—কলম্বোতে ইষ্টবেঙ্গল তো খেলতে যাচ্ছে। তার জন্য নিশ্চয়ই বিশেষ কোচিং দিচ্ছেন।

পি-কে—হ্যাঁ স্পেশাল কোচিং তো দিতে হবে। আমি ঠিক করেছি দু'সপ্তার জন্য বিশেষ কোচিং-এর। ৭ই জুলাই থেকে শুরু করবো। কিন্তু বর্তমানে অফিসের সমস্যা রয়েছে। আশা করছি তা যদি মিটে যায় তবে নির্দিষ্ট তারিখেই শুরু হবে।

প্রশ্ন—প্রশ্নটা ইষ্টবেঙ্গল সমর্থকদের পক্ষ থেকে এশীয় কাপ চ্যাম্পিয়নশীপে ইষ্টবেঙ্গলের কাছে আগাম জয়ের জন্য আশা করতে পারি কি?

পি-কে—নিশ্চয়ই। জিতবো বলেই তো যাচ্ছি। তাছাড়া থাইল্যাণ্ড, নেপাল, বাংলাদেশ এবং আর যে সমস্ত দলগুলি খেলতে আসবে তাদের খেলার ধরন আমার জানা। তাছাড়া ওদের খেলা থেকে আমাদের খেলার মান অনেক উন্নত।

আপনাকে ধন্যবাদ।

পি-কে—ধন্যবাদ।

বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়

খেলাধুলোর প্রাঙ্গণে

ফুটবলে আজ ভারতের যা হাল, ক্রিকেটে অষ্ট্রেলিয়ারও প্রায় তাই। দু-বছরের মধ্যে তিনজন প্রতিভাবান ক্রিকেটারের অবসর অষ্ট্রেলিয়াকে খুব মুশকিলে ফেলে দিয়েছে। তার ওপর কিম হিউজের ফর্ম পড়ে যাওয়া। লজ্জায় ঘেন্নায় কিম হিউজ নিজেই অধিনায়কত্ব ছেড়ে দেওয়ায় দলটির দায়িত্ব পড়ল অ্যালান বর্ডারের ওপর। আহা বেচারী! ভাবতে বড় কষ্ট হয় অধিনায়কের দায়িত্ব হাতে পাবার পর তিনি হালে পানি পাচ্ছেন না। নিজেদের দেশে অনুষ্ঠিত বেনসন অ্যাণ্ড হেজেস কাপে ভারত ও পাকিস্তানের কাছে মার খেলেন। তার আগে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ তাদের টেস্ট সিরিজে গো হারান হারাল। তবে ভদ্রলোকের ধৈর্য আছে বলতে হবে। সাংবাদিকদের বোঝালেন, এটা কোনো ব্যাপার নয়। খুব বেশি এক-দিনের ক্রিকেট খেলায় ক্লান্ত হয়েই তাঁর দল ভাল ফল করতে পারে নি।

ক্লান্তি শেষ হয়নি। ভারতের কাছে আবার হার। তারপর চলছে সম্প্রতি ইংলণ্ড সফর। সেখানে বর্ডার অবশ্য নিজে ব্যাটে ভাল রান পাচ্ছিলেন। একদিনের তিনটি খেলার দুটোতে জিতলেও তৃতীয় খেলাতে ইংল্যাণ্ড রুখে দাঁড়াল। ইংল্যাণ্ড জিতল বর্ডারকে বিস্মিত করে। তারপর হেডিংলিতে প্রথম টেস্টে বেশ সহজেই ইংল্যাণ্ড জয় ছিনিয়ে নিল। একমাত্র সহ অধিনায়ক হিলডিচ ও উইকেট রক্ষক ওয়েন ফিলিপ ছাড়া কেউই ব্যাটে রান পায়নি। অথচ এই হিলডিচ ছিল বাতিল খেলোয়াড়। ক্রিকেটের মুকুটহীন রাজা ভিভিয়ান রিচার্ডস অধিনায়ক হয়েই অসাধ্য সাধন করেছেন। উজ্জ্বল অধিনায়ক লয়েডের জীবনে যে সাফল্য কলঙ্কের দাগ ছিল তার মধ্যে অন্যতম নিউজিল্যাণ্ডের কাছে রাবার খোয়ানো। রিচার্ডস অধিনায়ক হয়েই সেই কলঙ্কমোচন করলেন। চার টেস্টের সিরিজে দুটি টেস্টে নিউজিল্যাণ্ডকে হারিয়ে দিলেন।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এখন একদিনের খেলায় ভারত যেখানে পৌঁচেছে তা অভাবনীয়। ১৯৮৩-র প্রুডেনসিয়াল, ১৯৮৪-র এশিয়ান কাপ, ১৯৮৫-র বেনসন অ্যাণ্ড হেজেস ও রথম্যানস কাপ নিজেদের দখলে নিয়ে এসে গাওসকার ক্রিকেট খেলায় তাঁর অধিনায়ক জীবনের শেষ করলেন বেনসন অ্যাণ্ড হেজেস কাপ জিতে। ক্রিকেটের ইতিহাসে এই প্রতিযোগিতায় ভারতের খেলা স্মরণীয় হয়ে থাকবে নানা দিক দিয়ে। দলগত সংহতি, তারুণ্যের উদ্দীপনা, দল পরিচালনা ও ফিল্ডিং দক্ষতা। এ সবকিছুর জন্যই গাওসকার স্মৃতিতে অমলিন থাকবেন আগামী বহুদিন পর্যন্ত। সেলাম গাওসকার!

o o o o o

আন্তর্জাতিক ফুটবল জগতে আজ যিনি সর্বাধিক পরিচিত তাঁর নাম মিচেল প্ল তিনি। প্লাতিনি প্রায় একার কাঁধে তাঁর দেশকে বহন করে বিশ্ব ফুটবলে ফরাসি দেশকে এক অনন্য আসন দিয়েছেন। ইউরোপীয়ান ফুটবলে ফ্রানজ বেকেনবাওয়ারের পর এমন সুন্দর চেহারা নিয়ে আর আসেননি। রাজার মতো চেহারা, তেমনি রাজকীয় খেলা। আগামী বিশ্ব কাপে এই খেলোয়াড়টির দক্ষতার ওপর ফ্রান্সের অনেকখানি নির্ভর করছে। প্লাতিনি মিডফিল্ডার। মধ্যমাঠ থেকে একটি দলকে এমন উদ্বুদ্ধ খুব কম খেলোয়াড়ই করতে পারেন।

ভারতীয় ফুটবল আজ প্রায় সর্বহারা অবস্থায় পৌঁচেছে। কলকাতায় লীগ শুরু হয়েছে। লীগের খেলাগুলো দেখলে চোখ দিয়ে জল আসে। এ কী খেলা আমরা দেখছি! ফেডারেশন কাপে জয়ী ইস্টবেঙ্গল দল বলতে গেলে প্রায় ভারতীয় দলই। তাদের পারফরমেন্স দেখলেই গোটা ভারতের ফুটবল বোঝা যায়। সব দিক দিয়েই যেন ভারত পেছিয়ে পড়ছে। একটা হীনমন্যতা ঘিরে ধরেছে ভারতের ফুটবলকে।

* * * *

১৯২৮ সালের লস এঞ্জেলস অলিম্পিক থেকে ভারতীয় হকির জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল। ১৯৮৫-তে এসে এখন এটা স্পষ্ট, হকিতে ভারতের আর কোনো আধিপত্য নেই। এবং যেভাবে চলছে তাতে মনে হয় ২০০০ বছর হবার আগেই বিশ্ব হকি মানচিত্র থেকে ভারতীয় হকি মুছে যাবে। এই পরিণতির জন্য যাঁরা সক্রিয় তাদের সত্যিই বাহবা দিতে হয়।

o o o o o

এই কদিন আগে উইম্বলডন টেনিস প্রতিযোগিতার পূর্বে ফ্রেঞ্চ ওপেন প্রতিযোগিতার খেলা হয়ে গেল। এখানে বিশ্ব-বিজয়িনী নাভ্রাতিলোভাকে হোঁচট খেতে হল তাঁর বান্ধবী ও দীর্ঘদিনের প্রতিযোগিনী ক্রিশলয়েডের কাছে। নাভ্রাতিলোভার পরাজয় যেমন বিস্ময়কর তেমনি বিস্ময়কর পুরুষদের খেলায় হল ম্যাকেনরোর হার। সবাই তাই উৎসুক হয়ে তাকিয়ে আছে পরবর্তী প্রতিযোগিতায় এঁদের ফসাফল দেখবার জন্য।

o o o o

বাংলায় সাঁতারু বিস্ময়-বালিকা বুলা চৌধুরী ছ মাসের জন্য এক কোচিং ক্যাম্পে অষ্ট্রেলিয়া যাচ্ছে। যা তার কাছে স্বপ্ন ছিল। বুলা নিজে খুবই উৎসাহী এ ব্যাপারে। ওঁর মা-বাবাও আনন্দিত। ভারতীয় অনেক মেয়েই সাঁতারে ইতিপূর্বে সামনের সারিতে এসেছেন কিন্তু প্রকৃত প্রশিক্ষণের অভাবে বিশ্ব সাঁতারে তারা কিছুই করতে পারে নি। বাংলার এই মেয়েটির ওপর আমাদের অনেক আশা। বিদেশে যদি সত্যকার প্রশিক্ষণ সে পায় তাহলে হয়তো আগামী ভবিষ্যতে বুলা ভারতের মুখ উজ্জ্বল করবে।

—ক্রীড়ারসিক

আমি ঢেঁকিশ্বর
শিবরূপে তোর পূজা
পেতে চাই
গ্রামে-গ্রামে এই বার্তা রটে গেল ক্রমে
আগাছা সাফ করে জল ও দুধ ঢালার পর
জল পেয়ে পেয়ে স্বয়ম্ভু
শিবলিঙ্গ দেখা গেল
শিবলিঙ্গ !!
ক্রমে মন্দির হোল
প্রচুর ভক্ত সমাগম হোল
মন্দিরের আয়ে
ঢেঁকিদা এখন ধনী

প্রথম বর্ষ, [redacted] সংখ্যা ([redacted], ১৩৯২)
HATEKHARI, 1st year, [redacted] Issue [redacted], 1985

আমি এখন বাবা, বাবার পোশাক পরি, বাবার মত
আপিসে যাই আর

বাবার মত ভেরোনাতে টাকা জমাই

ভেরোনা—উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতীক,
সুখ ও সমৃদ্ধির নিশ্চয়তা আনে এবং উদ্যমশীল যুবকদের কর্মের সংস্থান দেয়

VERONA COMMERCIAL CREDIT & INVESTMENT CO. LTD

ভেরোনা কমার্শিয়াল ক্রেডিট
এণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট কোম্পানী
লিমিটেড

রেজিঃ অফিস : শহীদ ক্ষুদিরাম বোস রোড,
মেদিনীপুর-৭২১১০১ ফোন : মিড ৮১৬
হেড অফিস : ৪৫/১, রফি আহমেদ কিদওয়াই রোড, পঞ্চমতলা-
কলিকাতা-৭০০০১৬

মূল্য : ২·৫০ পয়সা মাত্র।